

উচ্চমাধ্যমিক জীববিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়-৪: অণুজীব

প্রশ্ন ১ নিদিষ্ট পরজীবীর সংক্রমণে মানুষের রক্ত বংসন্তা এবং কাপুনিসহ জ্বর আসে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াও বিভিন্নভাবে পরজীবীর ক্ষতি থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে।

চৰ. বো. ২০১৭/

- ক. ইকোলজিকাল পিরামিড কী? ১
- খ. পামেলা দশা বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত রক্ত বংসন্তার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্বীপকের পরজীবী থেকে পরিত্রাণের উপায় বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যজালকের বিন্যাস সমবিত পিরামিড আকৃতির ছকই হলো ইকোলজিকাল পিরামিড।

খ পরিবেশে পানি শুকিয়ে গেলে *Ulothrix*-এর প্রেটোপ্লাস্ট বিভঙ্গ হয়ে কলোনি সৃষ্টি করে এবং মিউসিলেজ নিঃসৃত আবরণীতে অপত্য কোষগুলো আবৃত থাকে। এ অবস্থাকে বলা হয় পামেলা দশা। পামেলা দশা শৈবালকে শুক্ষতা থেকে রক্ষা করে। অনুকূল পরিবেশে কলোনি থেকে জুস্পোর উৎপন্নের মাধ্যমে নতুন শৈবাল সৃত তৈরি হয়।

গ উদ্বীপকে উল্লিখিত লক্ষণসমূহ যেমন রক্তবংসন্তা এবং কাপুনিসহ জ্বর এর কারণ ম্যালেরিয়া পরজীবী (*Plasmodium vivax*)।

রোগজীবাণুবাহী এনোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশকী যখন কোন সুস্থ মানুষকে দংশন করে তখন মশকীর লালার সাথে রোগ জীবাণুর স্পোরোজোয়েট মানবদেহে প্রবেশ করে। হেপাটিক সাইজোগনিনির পর ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তের লোহিত কণিকা আক্রমণ করে ও সেখানে অযৌন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে যাকে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনিনি বলে। লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে মেটাক্রিটোমেরোজোয়েট হিমোপ্লোবিনকে খাদ্য হিসেবে প্রাপ্ত করে। পরবর্তীতে লোহিত রক্ত কনিকা ভেঙ্গে মেরোজোয়েট বেরিয়ে আসে এবং পুনরায় নতুন লোহিত কণিকা আক্রমণ করে। এভাবে লোহিত রক্ত কণিকার ভাঙ্গনের ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বংসন্তা দেখা দেয়।

ঘ উদ্বীপকে উল্লিখিত ম্যালেরিয়া পরজীবী (*Plasmodium vivax*) থেকে পরিত্রানের উপায় নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো—

ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু স্ত্রী *Anopheles* মশকী বহন করে। এ মশকীর দংশনের ফলেই ম্যালেরিয়া জ্বর হয়ে থাকে। তাই ম্যালেরিয়া জ্বর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মশকীর প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে।

যেসব জলাশয়ে মশকী ডিম পাড়ে সেখানে পানির ওপর কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় তেল ছিটিয়ে দিলে পানির উপর একটি পাতলা স্তর সৃষ্টি হয়। ফলে এ স্তর ভেদ করে মশকীর লার্ভাগুলোর পক্ষে বাতাস প্রাপ্ত সম্ভবপ্র না হওয়ায় তারা মারা পড়ে। বি এইচ সি, ডায়েলিন্ড্রিন ইত্যাদি কীটনাশক ওষুধ তেলের সাথে মিশিয়ে পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর লার্ভা ও পিউপা মারা যায়। জলাশয়ে কই, খলসে, তেলাপিয়া জাতীয় লার্ভা খাদক মাছ চাষের মাধ্যমে মশকীর লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা যায়। জুড়েনাইল হরমোন পানিতে মিশিয়ে দিলে লার্ভাকে আজীবন লার্ভা করে রেখে দেওয়া যায়। দংশন উদ্যত মশকী হাত বা মসকুইটো র্যাকেট দিয়ে মেরে ফেলা। বিভিন্ন ফাঁদের সাহায্যে মশকী ধরা। বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান যেমন- সালফার ডাইঅক্সাইডের ধোয়া মশা তাড়াতে বা মেরে ফেলতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও বিকিরণ দিয়ে বন্ধ্যাত্মক সৃষ্টির মাধ্যমে মশার বংশ বিস্তার রোধ করা যায়। শয়নকক্ষে মশকীর ব্যবহার করা। দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ত্বক বা লোশন লাগানো। মশকী নিধন কয়েল জুলানো বা স্প্রে ব্যবহার করা। ঘরের দরজা জানালায় নেট লাগানো। মশার উৎপাত বেশি এবৃপ্ত জায়গা থেকে শয়ন কক্ষ দূরে রাখা।

প্রশ্ন ২ নিদিষ্ট পরজীবীর সংক্রমণে মানুষের রক্ত বংসন্তা এবং কাপুনিসহ জ্বর আসে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াও বিভিন্নভাবে পরজীবীর ক্ষতি থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে।

চৰ. বো. ২০১৮/

প্রশ্ন ২ মনি ও মৃত্তা দুই বোন, চট্টগ্রাম থেকে বাড়ী ফেরার কয়েকদিন পর তারা দু'জনই জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। তবে তাদের জ্বরের প্রকৃতি এক নয়। মনির কাপুনিসহ জ্বর আসলেও মৃত্তার হঠাতে প্রচন্ড জ্বর এসেছিল। রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায় যে, মনি রক্তবংসন্তা আর মৃত্তার রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা অনেক কম গেছে।

চৰ. বো. ২০১৮/

- ক. আদিকোষ কী? ১
- খ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে কী বোঝ? ২
- গ. মনি ও মৃত্তার জ্বরের লক্ষণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৩
- ঘ. মনি ও মৃত্তার জ্বর নিয়ন্ত্রণে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কোষে কোনো সুপ্রতিত নিউক্লিয়াস থাকে না সেই কোষই অদিকোষ।

খ কোনো জীবকোষ থেকে একটি নিদিষ্ট জিন বহনকারী DNA খণ্ডণ পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবকোষের DNA-এর সঙ্গে ঝোড়া দিয়ে তাতে কাঞ্জিত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটানোর কৌশলকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে DNA অণুর কাঞ্জিত অংশ মানুষ থেকে ব্যাকটেরিয়ায়, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে তৈরি জীবকে GMO বা GEO বা ট্রান্সজেনিক জীব বলা হয়।

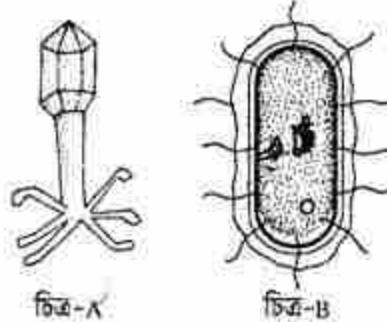
গ উদ্বীপকে বর্ণিত মনি ও মৃত্তার জ্বরের বিশেষ লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে, মনি ম্যালেরিয়া জ্বরে এবং মৃত্তা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। নিচে মনি ও মৃত্তার জ্বরের লক্ষণের মধ্যে অর্থাত ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হলো—
ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রথম দিকে মাথা ধরা, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। অন্যদিকে ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে শীত শীত অনুভূত হয়ে হঠাতে প্রচন্ড জ্বর দেখা দেয়। ম্যালেরিয়া জ্বরের তীব্রতায় কাপুনি আসে এবং জ্বর $104^{\circ}-106^{\circ}$ ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে ডেঙ্গু জ্বরে তেমন কাপুনি আসে না এবং তাপমাত্রা $103-105^{\circ}$ ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে থাকে। ৪৮ ঘণ্টা পর পর কাপুনি দিয়ে জ্বর আসা ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান লক্ষণ, তবে মেরুদণ্ডের ব্যাথাসহ কোমরে ব্যথা ডেঙ্গু জ্বরের বিশেষ লক্ষণ। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর লোহিত কণিকা দৃত ভাঙ্গতে থাকে, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর নাক, মুখ, চোখ, দাতের মাড়ি বা তুকের নিচে কথনই রক্ত ক্ষরণ হতে দেখা না গেলেও ডেঙ্গু রোগীর ক্ষেত্রে এর যে কোনোটি ঘটতে পারে।

ঘ মনি ও মৃত্তার জ্বর নিয়ন্ত্রণে অর্থাত ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিচে বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হলো—

ম্যালেরিয়া জ্বর হলে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে এবং দেরি না করে দৃত ডাঙ্গারের নিকট যেতে হবে। ম্যালেরিয়া জ্বরের অনুমোদিত ঔষধ হলো কুইনাইন। ডাঙ্গারের পরামর্শ অনুযায়ী এ ঔষধ সেবন করতে হবে। ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু স্ত্রী *Anopheles* মশকী বহন করে। এ মশকীর দংশনের ফলেই ম্যালেরিয়া জ্বর হয়ে থাকে। তাই ম্যালেরিয়া জ্বর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মশকীর প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে।

ঘরে মশারী ব্যবহার করেও জ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। অন্যদিকে ডেজু জ্বর হলেও রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে। ডেজু জ্বরে রোগীকে কখনই অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া যাবে না, এটি রোগীর মৃত্যু ঘটাতে পারে। বাথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিতে হবে। রোগীকে প্রচুর পানি, ফলের রস ও তরল খাবার দিতে হবে। মাথায় পানি ঢালা, গায়ের ঘাম মুছে দেওয়া, ডেজু কাপড় দিয়ে শরীর স্পজ্জা করে দেওয়া রোগীর জন্য ফলদায়ক। এছাড়া *Aedes* মশকী যেহেতু এ রোগের জীবাণু বহন করে তাই এই মশকী নিখনের মাধ্যমেও ডেজু জ্বরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এ মশা ময়লা পানিতে জন্মায় তাই ফুলের টব, টায়ার, ড্রাম, শাড়ি-পাতিল ইত্যাদিতে যেন পানি জামে না থাকে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। উভয় ধরনের জ্বর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এসব পরামর্শ বিশেষজ্ঞের থাকতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩



রা. বো. ২০১৬/

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| ক. | কলেরা রোগের জীবাণুর নাম লেখো। | ১ |
| খ. | ছি-বিভাজন প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. | A অণুজীবের গঠন বর্ণনা করো। | ৩ |
| ঘ. | মানবকল্যাণে B অণুজীবের ভূমিকা লেখো। | ৪ |

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কলেরা রোগের জীবাণু হলো *Vibrio cholerae* নামক ব্যাকটেরিয়া।
খ ছিবিভাজন হলো আদিকোষী জীবের এক ধরনের অযৌন প্রজনন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে মাতৃকোষটি কিছুটা লম্বাটে হয় এবং কোষটির মধ্যভাগে কোষ প্রাচীরে বলয় আকারে সংকোচন সৃষ্টি হয়। এ সংকোচন ক্রমশ কোষকেন্দ্রের দিকে গভীর হতে থাকে। একই সময়ে কোষের নিউক্লিওবস্ট্রু ডাম্বেল আকার ধারণ করে। এরপর সংকোচন গভীর হয়ে গেলে নিউক্লিওবস্ট্রুসহ কোষটি দু'ভাগে বিভক্ত হয় এবং দুটি অপ্ত্য কোষের সৃষ্টি হয়। ব্যাকটেরিয়া সাধারণত ছিবিভাজন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

গ চিত্র-A তে দেখানো অণুজীবটি হলো T₂- ব্যাকটেরিওফায়। T₂-ফায় ভাইরাসের দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়, যথা— মাথা ও লেজ।

T₂-ফায় ভাইরাসের মাথাটি স্ফীত ও ঘড়ভূজাকৃতির। এটি প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরি। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০-১০০ nm এবং প্রস্থ ৬৫ nm। থলির মতো এ স্ফীত অংশের ভেতরে ছি-সূত্রক একটি DNA অণু প্যাচানো অবস্থায় থাকে। এই DNA-তে ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকে। DNA-তে জিন থাকে প্রায় ১৫০টি।

T₂-ফায়ের লেজের প্রধান অংশটি একটি ফাঁপা নলের মতো। লেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫-১১০ nm এবং ব্যাস প্রায় ১৫-২৫ nm। লেজের উপরিভাগে সুস্পষ্ট চাকতির মতো একটি কলার আছে। লেজের অভ্যন্তরে কোনো DNA নেই। নিচের দিকে একটি বেসপ্রেট, কাঁটার মতো ৬টি স্পাইক ও ৬টি প্রশর্ক তন্তু আছে। লেজ, কলার, বেসপ্রেট, স্পাইক এবং প্রশর্ক তন্তু সবই প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

T₂-ব্যাকটেরিওফায় ভাইরাসের দেহে কোনো নিউক্লিয়াস, কোষ প্রাচীর ও অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই।

ঘ চিত্র B এর অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া মানবকল্যাণে ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাগরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকা যেমন— কলেরা, যষ্মা, টাইফিয়েড, ডি.পি.টি. ইত্যাদি রোগের টিকা ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া মাটির জৈব পদার্থ সঞ্চয় করে উর্বরতা বৃদ্ধি করে। নানাবিধ আবর্জনা পচানোর মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জৈব পদার্থ প্রস্তুত করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া মাটিতে নাইট্রোজেন স্থাপন করে আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উত্তিদের মূলের নড়িউলে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া জমিতে স্ফুরিত পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া ফসলের ফলন বৃদ্ধিতেও ব্যবহৃত হয়।

শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার ব্যাপক। চা, কফি, তামাক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণে, দুঃখজাত শিল্পে, পাটি শিল্পে, চামড়া তৈরি, ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি, আসিটোন তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

মানুষের অন্তরে *E. coli* ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন-বি, ভিটামিন-কে, ভিটামিন-বি_১, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে। জিন প্রকোষ্ণলেও ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও আবর্জনা পচনে, পর্যবেক্ষণে, পানিতে ভাসমান তেল অপসারণেও ব্যাকটেরিয়ার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে মানবকল্যাণের জন্য। তাই মানবকল্যাণে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা অনন্বীক্ষ্য।

প্রশ্ন ▶ ৪ গবাদি পশু ঘাস ও খড় খায়। এদের প্রধান উপাদান সেলুলোজ। গবাদি পশুর অন্তে বসবাসকারী এক প্রকার কোষীয় জীবাণু সেলুলোজ হজমে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। অপর একটি অকোষীয় জীবাণু এই কোষীয় জীবাণুকে সংক্রমণ করে এর দেহের অভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

রা. বো. ২০১৮/

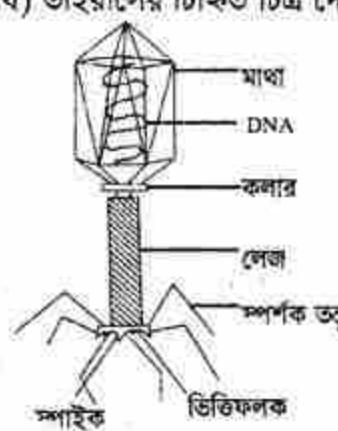
- | | | |
|----|---|---|
| ক. | ভাইরাস কী? | ১ |
| খ. | হেপাটিক সাইজোগনি বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. | উদ্বীপকের অকোষীয় জীবাণুটির চিহ্নিত চিত্র আঁক। | ৩ |
| ঘ. | উদ্বীপকের কোষীয় জীবাণুটির কী কী ভূমিকা রাখতে পারে তা বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাইরাস হলো নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত অতি আণুবীক্ষিক বস্তু যা জীবদেহের অভ্যন্তরে সক্রিয় হয়ে রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।

খ সৃজনশীল ১০ এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ উদ্বীপকে উল্লিখিত অকোষীয় জীবাণুটি হলো ফায় ভাইরাস। নিচে একটি ফায় (T₂-ফায়) ভাইরাসের চিহ্নিত চিত্র দেওয়া হলো—



চিত্র : T₂ ফায় ভাইরাস

ঘ উদ্বীপকের বর্ণনা থেকে বলা যায়, কোষীয় জীবাণুটি হলো এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া। যার বৈজ্ঞানিক নাম *Escherichia coli*। *E. coli* ব্যাকটেরিয়া মানব জীবনে উপকারী ও অপকারী দুই ধরনের ভূমিকাই রাখতে পারে। যা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

E. coli ব্যাকটেরিয়া প্লকোজ ও ল্যাকটোজ ভেঙে ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় এসিড ও গ্যাস তৈরি করে। এছাড়া শতকরা ৮৫ ভাগ *E. coli* কোলিসিন (Colicin) বা কোলিব্যাকটেরিন (Colibacterin) নামক প্রতিষেধক তৈরি করে। *E. coli* মানুষের অন্যান্য আণ্টিক জীবাণুর সাথে মিলিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, বিশেষ করে ভিটামিন K, E এবং P সংশ্লেষণ করে। তাছাড়া এটি বর্তমান সময়ের আলোচিত বিষয় জিন প্রক্রোশলে রিকমিনেন্ট DNA তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ইনসুলিন তৈরিতে এবং অ্যান্টিসেপ্টিক ও অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে পরীক্ষামূলকভাবে জীবাণু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আবার ভাইরাসজনিত রোগ, ক্যান্সার ও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কৃত কৃত প্রোটিনের গ্রুপ ইন্টারফেন উৎপাদনের জন্য *E. coli* ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে *E. coli* মানুষের খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

E. coli এর বিশেষ কিছু প্রকরণ গবাদিপশুর দুধখ পোষ্য শাবকের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে। *E. coli* এর কিছু প্রজাতি মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে রক্ত দূষণ, উদরের আলরণ ঝিল্লির প্রদাহ, ঘৃত ও পিণ্ঠথলির প্রদাহ, ম্যানিনজাইটিসসহ নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া এদের কিছু প্রজাতি শিশুর ডায়ারিয়া রোগ সৃষ্টি করে বিশেষ করে মানুষসহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর মলের সাথে নির্ণত হয়ে *E. coli* পানি ও খাবার দূষিত করে। এতে করে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

প্রমাণ ৫ গতরাত থেকে তানিয়ার নমিসহ প্রবল ডায়ারিয়া, এতে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং রক্তচাপ কমে যায়। আবার তার বান্ধবী রিতা কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত, সাথে শরীরে বাথা ও র্যাশ দেখা গিয়েছে।

(দি. বে. ২০১৭)

ক. ক্যাপসোমিয়ার কী? ১

খ. ম্যালেরিয়া পরজীবীর দুটি পোষক প্রয়োজন কেনো? ২

গ. তানিয়ার রোগটির জন্য দায়ী জীবাণুর একটি আদর্শ গঠনের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. রিতার রোগের কারণ ও প্রতিকার, তানিয়ার রোগ থেকে ভিন্ন-বিশেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাইরাস ক্যাপসিডের প্রতিটি প্রোটিন অণুই হলো ক্যাপসোমিয়ার।

খ ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে যৌন ও অয়োন চক্র অঙ্গোঅঙ্গীভাবে জড়িত। আবার এ চক্র দুটি একটি পোষকদেহে সম্পন্ন হয় না। পরজীবীটি মশকীর দেহে যৌন জনন এবং মানুষের দেহে অয়োন জনন সম্পন্ন করে। সুতরাং পরজীবীটির পূর্ণাঙ্গ জীবনচক্র সম্পন্ন করার জন্যই দুটি পোষক প্রয়োজন।।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তানিয়ার রোগটি হলো ক্লেবা। আবার এই রোগের জন্য দায়ী জীবাণু হলো ব্যাকটেরিয়া। নিম্নে ব্যাকটেরিয়ার আদর্শ গঠনের বর্ণনা দেওয়া হলো—

প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ঘিরে একটি জড় কোষ প্রাচীর থাকে, এর প্রধান উপাদান পেপটিডোগাইকান। বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষ প্রাচীরকে ঘিরে জটিল কর্বোহাইড্রেট দিয়ে বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি পুরু স্তর থাকে, যাকে ক্যাপসিটুল বলে। অনেক ব্যাকটেরিয়াতে একটি ফ্ল্যাজেলাম বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। ফ্ল্যাজেলা ছাড়াও কোনো ব্যাকটেরিয়াতে খাটো ও শক্ত পিলি থাকে। সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টন করে সজীব প্লাজমামেম্ব্রেন অবস্থিত। ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেম্ব্রেন কথনে কথনে ডেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে মেমোজোম গঠন করে। সাইটোপ্লাজম মেম্ব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বগানীন, ষষ্ঠ। এতে বিদ্যমান থাকে ছোট ছোট কোষ গহ্বর, চৰি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত উরেখযোগ্য অঙ্গাণ হলো মুক্ত রাইবোজেম এবং পলিরাইবোজেম। কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকার ও বৃত্তাকার ক্রোমোসোম থাকে, যাকে প্লাসমিড বলে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রিতার রোগের কারণ ও প্রতিকার, তানিয়ার রোগ থেকে ভিন্ন। কারণ—
রিতার রোগের লক্ষণ থেকে বোৱা যায় তার ডেজু জ্বর হয়েছে যা ভাইরাসজনিত। কারণ কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড জ্বর থাকা, সাথে শরীরে ব্যথা ও র্যাশ দেখা দেওয়া ডেজু জ্বরের লক্ষণ। আবার এ রোগ থেকে প্রতিকারের জন্য প্রথমত অ্যাসপ্রিন জাতীয় ওষুধ পরিয়োগ করতে হবে। ব্যথা ও জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষুধ দিতে হয়। রক্তের সাম্যতা রক্ষার্থ জন্য প্রেটিলেট ট্রাসফিউশন এবং প্রয়োজন পড়ে। রোগীকে প্রচুর পানি, ফলের রস ও তরল খাবার দিকে হয়। মাথায় পানি ঢালা, গায়ের ঘাম মুছে দেওয়া, তেজা কাপড় দিয়ে শরীর স্পষ্ট করে দেয়া রোগীর জন্য ফলদায়ক হয়।

অপরদিকে তানিয়ার রোগটি হলো কলেরা এবং তা ব্যাকটেরিয়াজনিত। কারণ বমিসহ প্রবল ডায়ারিয়া, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, রক্ত কমে যাওয়া এগুলো সবই কলেরা রোগের লক্ষণ। আবার এ রোগের প্রতিকার হলো-কলেরা রোগীর দেহ থেকে অতিমাত্রায় লবণ ও পানি বের হয়ে যায়। তাই পানি ও লবণের সমষ্টিয়ের জন্য শিরায় স্যালাইন দেওয়া হয়। সাথে ডাবের পানি ও খাবার স্যালাইন দিতে হয়। এছাড়া ডাঙ্কারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হয়। মোট কথা রোগীর দেহে যাতে পানিশুণ্যতা দেখা না দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবেই বোৱা যায় যে, রিতার রোগের কারণ ও প্রতিকার, তানিয়ার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

প্রমাণ ৬ রফিক ও শফিক অণুজীব নিয়ে গবেষণাগারে কাজ করেছেন। রফিকের গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে অকোষীয় রোগসৃষ্টিকারী তাপুজীব এবং শফিকের আদিকোষীয় অণুজীব। রফিকের পর্যবেক্ষণে জানা গেল তার অণুজীবের শফিকের অণুজীবকে ভক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(দি. বে. ২০১৬)

ক. মেটাকাইনেসিস কী? ১

খ. এভেমিক জীব বলতে কী বোঝ? ২

গ. রফিক ও শফিকের ব্যবহৃত অণুজীব দুটির পার্থক্য করো। ৩

ঘ. রফিকের পর্যবেক্ষণটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় স্পিন্ডল যন্ত্রের বিমুক্তীয় অঞ্চল ক্রোমোসোমের বিন্যস্ত হওয়াকে বলা হয় মেটাকাইনেসিস।

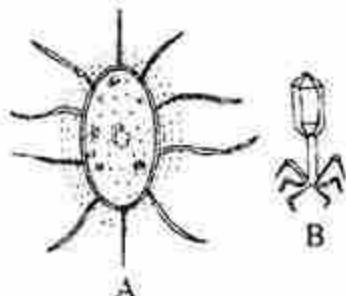
খ যেসব জীব (উত্তিদ ও প্রাণী) একটি নিনিট প্রাণিতোগলিক অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, তাদেরকে ঐ অঞ্চলের এভেমিক জীব বলা হয়। হেমন- হড়িয়াল ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের এভেমিক প্রাণী। এদেরকে ওরিয়েন্টাল অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোনো অঞ্চলে পাওয়া যায় না।

গ রফিকের ব্যবহৃত অণুজীবটি হলো ভাইরাস এবং শফিকের ব্যবহৃত অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। নিচে এদের মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো—

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. এর অকোষীয় এবং এতে নিউক্লিয়াস নেই।	i. এরা কোষীয় এবং আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
ii. এর সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	ii. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
iii. এতে সাইটোপ্লাজম বা অন্য কোনো ক্ষুদ্রাণ নেই।	iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাণ আছে।
iv. এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	iv. এদের দেহকোষে এনজাইম থাকে।
v. ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে।	v. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে না।
vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	vi. এদের কোষে DNA ও RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

৫. রফিকের ব্যবহৃত অণুজীবটি অর্থাৎ ভাইরাস শফিকের ব্যবহৃত অণুজীব অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া ভক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এসব ভাইরাস ব্যাকটেরিওফায় নামে পরিচিত। যেমন— *T*₂ ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে বৎশবৃদ্ধি ঘটায়। এর বৎশবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ডাগ করা যায়—
উভয়ের বাকি অংশ সূজনশীল ৫ এর ‘d’ প্রশ্নাত্তর দেখো।

୧



क्र. नं. २०१७।

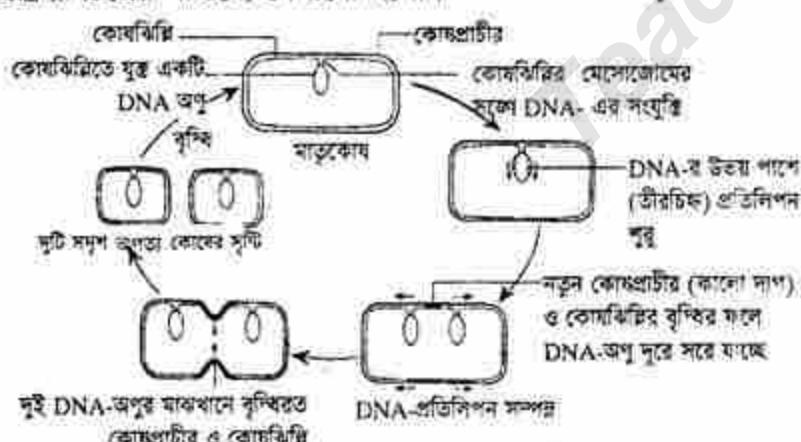
- | | | |
|----|--|---|
| ক. | HIV কী? | ১ |
| খ. | হেমোঅ্রেজিক ডেজ্যু বলতে কী বোঝা? | ২ |
| গ. | উদ্ধীপকে উল্লিখিত চিকিৎসা প্রতিনিধিত্বকারী অণুজীবের দুটি সংখ্যা বৃন্দি প্রক্রিয়া চিকিৎসার সাহায্যে দেখাও। | ৩ |
| ঘ. | উদ্ধীপকে উল্লিখিত চিকিৎসা 'B' কে কীভাবে মানব কল্যাণে কাজে লাগানো যায়? বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

୧ ନିଃପ୍ରମ୍ରାଦ ଉତ୍ତର

ক HIV হলো মানুষের এইডস রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস।

খ সাধারণ ডেজুন্জুরের জটিল বৃপ্তি হলো হেমোরেজিক ডেজুন্জুর। এতে কয়েকদিন পর রোগীর নাক, মুখ দাঁতের মাড়ি ও তুকের নিচে রক্তক্ষরণ দেখা দেয়। পায়শানার সাথে রক্ত যেতে পারে। রক্তবর্ষি হতে পারে। রক্তে প্লাটিলেট হ্রাস পায় এবং রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র A হলো ব্যাকটেরিয়া। হি-বিভাজন পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে। নিচে হি-বিভাজন প্রক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো।



চিত্র: একটি ব্যাক্টেরিয়াম (*E. coli*) প্রি-বিভাজন

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র B হলো T-ব্যাকটেরিওফায় ভাইরাস।
মানব কল্যাণে ভাইরাসকে যেভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিচে
বিশেষণ করা হলো—

- i. প্রতিষেধক তৈরিতে: বসন্ত, পোলিও, প্লেগ, টাইফয়েড, জন্মাতজ্ঞক প্রভৃতি রোগের টিকা বা ভ্যাক্সিন তৈরিতে ভাইরাসের বাণিজ্যিক ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
 - ii. জিনতত্ত্ব ও আণবিক জীববিদ্যায়: জিনতত্ত্বীয় এবং আণবিক জীববিদ্যা (Molecular Biology) বিধয়ক বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণায় ভাইরাস ব্যবহৃত হয়।
 - iii. ব্যাকটেরিওফায় হিসেবে: কিছু ভাইরাস মানুষের জন্য ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিওফায়েক ধরণস ক্ষেত্রে আমাদের উপকার করে।

- iv. ওষুধ হিসেবে: টাইফয়োড, কলেরা, রক্ত আমাশয়, প্লেগ ইত্যাদি নামক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে কয়েকটি ফায় ভাইরাস ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
 - v. পোকামাকড় দমনে: ভাইরাসকে কতিপয় ক্ষতিকারক ও বিপদজনক কীটপতঙ্গ দমনে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে Nuclear Polyhydrosis Virus-কে পতঙ্গনাশক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।
 - vi. বিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণে: জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে ডানলাভ করার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে ভাইরাস, কারণ ভাইরাসে একই সাথে জড় এবং জীবের বৈশিষ্ট্যবলী রয়েছে।
 - vii. ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে: টিউলিপ ফুলের পাপড়িতে বিভিন্ন ছাপ মূলত ভাইরাসের আক্রমণ। ছাপযুক্ত টিউলিপ ফুল সৌন্দর্যের জন্য বিশ্বখ্যাত।
 - viii. জৈবিক নিয়ন্ত্রণ: বর্তমানকালে জৈবিক নিয়ন্ত্রণে ভাইরাসকে ব্যবহার করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় খরগোশ নিয়ন্ত্রণে মির্কোভাইরাসকে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ▷ ৮ আসলাম ও শফিক স্বাদশ প্রেমির ছাত্র। উভয়ের বাবা কৃষক। আসলামের একটি পেপের বাগান আছে। আসলাম লক্ষ্য করে পাতার বোঁটা ও ফলে তৈলাক্ত পানি-সিঙ্গ পাঢ় সবুজ দাগ সৃষ্টি হয়েছে। পেপে হলুদ হয়ে যায় এবং পুষ্ট হবার আগেই ঝরে পড়ে। শফিক তার বাবার সাথে ধান খেতে শিয়ে দেখে পাতায় ভেজা অধিকচে লম্বা দাগের সৃষ্টি হয়েছে। দাগগুলো ক্রমশ হলদে সাদা বর্ণ ধারণ করছে। দুই বন্ধু মিলে কলেজের জীববিজ্ঞান শিক্ষকের নিকট থেকে এ সমস্যা দূরীকরণের পরামর্শ গ্রহণ করে উপকৃত হলো।

ক. দ্বি-পদ নামকরণ কী? ১

খ. মাশবুম বলতে কী বোঝা? ২

গ. জীববিজ্ঞানের শিক্ষক রোগ প্রতিরোধে আসলাম ও শফিককে
কী পরামর্শ দিয়েছিলেন? ৩

ঘ. আসলাম ও শফিকের সমস্যা একই ধরনের হলেও প্রতিকারের
উপায় ভিন্ন। কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ICBN এর নীতিমালা অনুযায়ী একটি গণ ও প্রজাতি নামক দুটি পদের সমষ্টিয়ে কোনো জীবের বৈজ্ঞানিক নাম প্রদানটি ছিপদ নামকরণ।

৪ Agaricus গণভৃক্ত ছত্রাকই মাশবুম নামে পরিচিত। এরা মৃতজীবী ছত্রাক। এদের দেহ মাইসেলিয়াম এবং ফুটবডি এই দুই অংশে বিভক্ত। ফুটবডির নিচের দিকে দণ্ডাকার স্টাইপ এবং স্টাইপের উপরে ছাতার ন্যায় পাইলিয়াস বিদ্যমান। স্টাইপ এবং পাইলিয়াস মিলে ছাতার ন্যায় ফুটবডি গঠন করে বলে এদেরকে বাণ্ণের ছাতা নামেও অভিহিত করা হয়।

ଶ୍ରୀ ଆସଲାମେର ପୈପେ ବାଗାନେର ରୋଗେର ଲକ୍ଷ୍ଣଗୁଲୋ ଦେଖେ ବୋକ୍ତା ଯାଏଁ, ପୈପେ ଗାଛଗୁଲୋ ରିଂସଟ୍ ରୋଗେ ଆଜ୍ଞାନ୍ତ ହେଁଥେଛେ । ଏଟି ଭାଇରାସଧାରିତ ରୋଗ । ଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନେର ଶିଫକ ଆସଲାମକେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ—

১. রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ করতে হবে।
 ২. আক্রান্ত গাছ শনাক্ত করে অপসারণ করতে হবে।
 ৩. PRSV মুক্ত বীজ থেকে উৎপাদিত চারা জমিতে রূপণ করতে হবে।

৪. PRSV প্রতিরোধক জাতের পেপের চাষ করতে হবে।
 ৫. আক্রান্ত বাগানের ভেতরে নতুন করে চারা রোপন করা যাবে না।
 আবার শফিকের ধানক্ষেতের রোগ লক্ষণগুলো দেখে বোৱা যায় ধান
 গাছগুলো লিফট্রাইট রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এটি *Xanthomonas oryzae* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে হয়ে থাকে। এ রোগ প্রতিরোধে
 শিক্ষক শফিককে নিম্নলিখিত পরামর্শ দিয়েছিলেন—

১. রোগ প্রতিরোধক প্রকরণ চাষ করতে হবে।
২. বীজ বপনের পূর্বে জমির আগাছা বিনাশ করতে হবে।
৩. বীজ বপনের পূর্বে বীজ শোধন করে নিতে হবে।
৪. পাতা না কেটে চারা রোপন করতে হবে এবং নাইট্রোজেন সার
 সময়মত সঠিক পরিমাণে প্রয়োগ করতে হবে।
৫. জমিতে পানি সেচের সময় রিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।

৬ আসলাম ও শফিক উভয়ের ফসলই অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত এবং
 উভয় ফসলেই প্রাথমিক তাৎপর্য দাগের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে রোগ
 দুটির মিল থাকলেও এদের প্রতিকারের উপায় ডিন।

আসলামের পেপে বাগানকে রিস্পট রোগ থেকে রক্ষার জন্য আক্রান্ত
 পেপে গাছগুলোকে শনাক্ত করে তা বাগান থেকে উপরে মাটির নিচে
 পুতে ফেলতে হবে। সুস্থ সবল গাছগুলোকে জাল দিয়ে ঢেকে দিতে
 হবে যাতে পতঙ্গের মাধ্যমে রোগের বিস্তার বাধাগ্রস্ত হয়। যেহেতু
 একিদ জাতীয় পতঙ্গের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় সেজন্য পেস্টিসাইড
 স্প্রে করতে হবে। রোগাক্রান্ত জমিতে পেপে গাছের প্রুনিং বন্ধ রাখতে
 হবে, কারণ কাটা-ছেড়া স্থান দিয়ে রোগাক্রমণ ঘটে।

আবার শফিকের ধানক্ষেতকে ব্রাইট রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রথমেই
 আক্রান্ত গাছগুলোকে সরিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত পাতায়
 স্টেপটোসাইক্লিন অ্যান্টিবায়োটিক স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।
 রোগলক্ষণের সাথে সাথে Granosan M অথবা Agrosan sws প্রয়োগে
 সুফল পাওয়া যায়। জমিতে পানি সেচের সময় তাতে রিচিং পাউডার (২
 কে.জি./হেক্টের) ব্যবহার করতে হবে। এতে রোগের প্রকোপ কমে যায়।
 উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আসলাম ও শফিকের সমস্যা
 একই ধরনের হলেও প্রতিকারের উপায় ডিন।

প্রশ্ন ১৯ গ্রুপ A : ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, জলাতঙ্গ

গ্রুপ B : যক্ষা, নিউমোনিয়া, টিটেনাস

/সি. লে. ২০১৭/

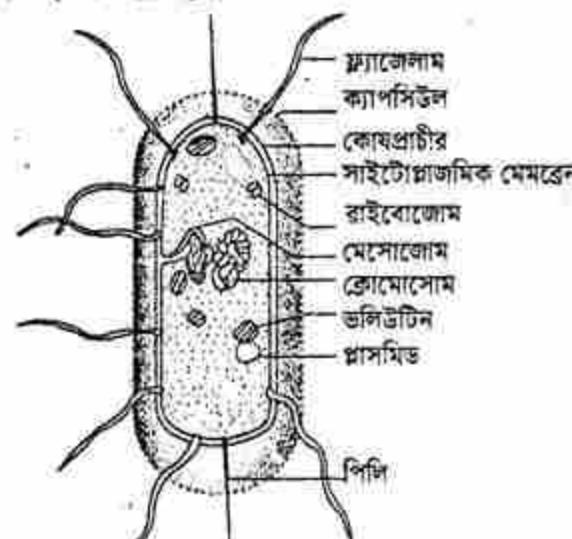
- ক. ভিরিয়ন কী? ১
- খ. ডেজু কেন মানুষের জন্য বিপদজনক? ২
- গ. গ্রুপ B এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের চিহ্ন চিহ্ন করো। ৩
- ঘ. গ্রুপ A এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব সর্বদাই অন্যের সহায়তায়
 বংশবিস্তারে সক্ষম— উত্তিতি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিউক্লিক আসিড ও একে ঘিরে অবশ্যিক ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত
 এক একটি সংক্রমণক্ষম সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাই হলো ভিরিয়ন।

খ ডেজু একটি ফ্ল্যাভিভাইরাস জনিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির
 শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যাথা হয়। হিমোরেজিক ডেজু জ্বরের ক্ষেত্রে
 দাতের মাড়ি, নাক ও মুখ দিয়ে রক্তকরণ হয়। অত্যিক রক্তকরণ হতে
 পারে। রক্তে অনুচক্রিকা খুব কমে যায়। যথোপর্যুক্ত চিকিৎসা না হলে
 রোগী মারাও যেতে পারে। এসকল কারণে ডেজু মানুষের জন্য
 বিপদজনক।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রুপ 'B' অর্থাৎ যক্ষা, নিউমোনিয়া, টিটেনাস
 রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। নিম্নে ব্যাকটেরিয়ার
 চিহ্নিত চিত্র অংকন করা হলো—



চিত্র : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রুপ A এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব হলো
 ভাইরাস। ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো সজীব
 কোষের অভ্যন্তরে এরা বংশবৃদ্ধি করে। যেমন, T₄ ফায় ভাইরাস E.
coli ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি করে। ভাইরাস তথা T₄ ফায় এর বংশ
 বিস্তার বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুৱা যায় এবং ভাইরাস বংশ বিস্তারের জন্য
 অন্যের উপর নির্ভরশীল। T₄ ফায়ের বংশ বিস্তার—

স সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস
 DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের
 বিস্তৃতি। স্পর্শক তত্ত্ব সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের পায়ে
 লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিন্ন হয়ে যায় এবং
 ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে
 অন্তর্ভুক্ত হলো প্রবেশ করিয়ে দেয়।

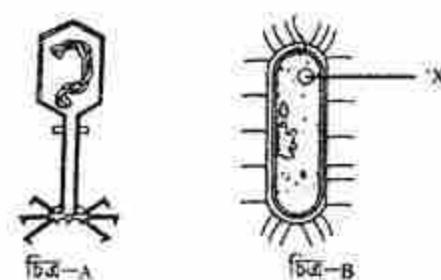
সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় : ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন
 ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস
 DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন
 ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ
 পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিন্ন করে নতুন
 ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে
 পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, T₄ ফায় ভাইরাস সর্বদাই
 অন্যের সহায়তায় অর্থাৎ *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় বংশবিস্তারে
 সক্ষম।

প্রশ্ন ১০



/সি. লে. ২০১৭/

- ক. ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুর নাম লিখো। ১
- খ. হেপাটিক সাইজোগনি বলতে কি বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের 'B' চিত্রের গঠন বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. 'A' এর বংশ বৃদ্ধিতে 'B' এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুর নাম *Plasmodium vivax*.

খ. মানুষের যকৃত কোষে ম্যালেরিয়া প্রজীবীর যে অয়ৈন জনন সম্পন্ন হয় তাকে হেপাটিক সাইজোগনি বলে। হেপাটিক সাইজোগনি নিম্নলিখিত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যথা- ১. প্রি-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি, ২. এরো-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি।

গ. উদ্বিগকের চিকিৎসা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াম। প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ধিরে একটি জড় কোষ প্রাচীর থাকে। এর প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান। বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষ প্রাচীরকে ধিরে জটিল কর্ণেহাইড্রেট দিয়ে বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি পুরু ঝুর থাকে, যাকে ক্যাপসিউল বলে। অনেক ব্যাকটেরিয়াতে একটি ফ্ল্যাজেলাম বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। ফ্ল্যাজেলা ছাড়াও কোনো ব্যাকটেরিয়াতে থাটো ও শক্ত পিলি থাকে। সাইটোপ্লাজমকে বেস্টম করে সজীব প্লাজমামেচ্রেন অবস্থিত। ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেচ্রেন কখনো কখনো ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে মেসোজোম গঠন করে। সাইটোপ্লাজমিক মেচ্রেন, দিয়ে পরিবেশিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বণ্টন, ব্রহ্ম। এতে বিদ্যমান থাকে ছোট ছোট কোষ গুৰু, চর্বি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য অঙ্গাণু হলো মুক্ত রাইবোসোম এবং পলিরাইবোসোম। কোবে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি কৃত্রিকার ও বৃত্তাকার ক্রোমোসোম থাকে, যাকে প্লাজমিড বলা হয়।

ঘ. উদ্বিগকের চিকিৎসা-A হলো T_2 ব্যাকটেরিওফায় এবং চিকিৎসা-B হলো ব্যাকটেরিয়াম (*E. coli*)। যে সকল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে তাদের ব্যাকটেরিওফায় বলে। T_2 ব্যাকটেরিওফায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াকে (*E. coli*) আক্রমণ করে এবং তাদের দেহস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে থাকে। 'A' তথা ব্যাকটেরিওফায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে B-এর গুরুত্ব অপরিসীম। T_2 ব্যাকটেরিওফায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথমে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরে এনজাইমের কার্যকারিতায় ব্যাকটেরিয়ামের প্রাচীরে ছিন্ন তৈরির মাধ্যমে ফায় DNA ব্যাকটেরিয়াম কোষে প্রবেশ করায়। ব্যাকটেরিয়াম কোষের অভ্যন্তরে অসংখ্য ফায় DNA এবং ফায় কোটি প্রোটিন প্রোটোপ্লাজমাতে নতুন ফায়ের মাথা, লেজ, স্পর্শকত্তু ও স্পাইক তৈরি করে। এরপর অপত্য ফায় DNA এবং অন্যান্য প্রোটিন অংশগুলো মুক্ত হয়ে অসংখ্য নতুন T_2 ফায় তৈরি হয়। সবশেষে ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর বিগলনের মাধ্যমে অগত্যা T_2 ব্যাকটেরিওফায়গুলো বাইরে বের হয়ে আসে। এভাবে 'A' তথা T_2 ফায় তার বংশবৃদ্ধি করে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, 'A' -এর বংশবৃদ্ধি 'B' তথা ব্যাকটেরিয়ামের অভ্যন্তরেই ঘটে থাকে এবং 'B' এর অনুপস্থিতিতেই 'A' এর বংশবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব।

সুতরাং বিশ্লেষণমূলক এ আলোচনা শেষে বলা যায় যে, 'A'-এর বংশবৃদ্ধিতে 'B' -এর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রমাণ-১১ 'X' ও 'Y' উভয়ই জুরে আক্রান্ত হলেও প্রকাশিত লক্ষণ ভিন্ন। 'X' এর প্রচল মাথা ব্যথাসহ অস্থি সন্ধিতে ব্যথা এবং চামড়ায় লাল রঞ্জন দেখা যাচ্ছে। 'Y' এর কান্দনিসহ জুর, বমি বমি ভাব ও রক্তস্থলতা দেখা দিয়েছে।

/চ. কো. ২০১৭/

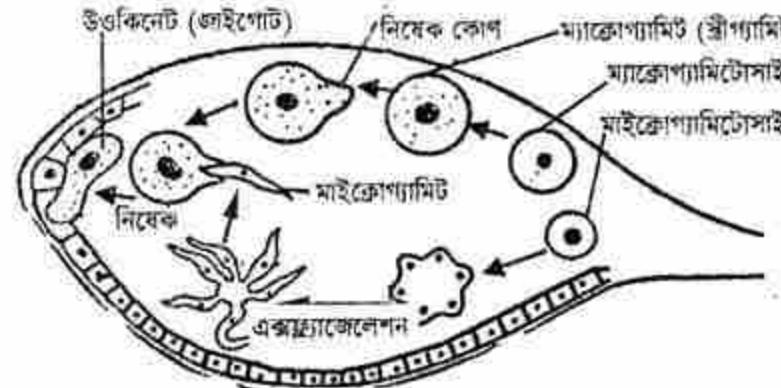
- ক. প্লাজমিড কী? ১
- খ. লাইটিক চৰ্ক বলতে কী বোৰা? ২
- গ. 'Y' যে জুরে আক্রান্ত সেই জীবাণুটি মশকীর ক্রপের ভিতরে জীবনচক্রের যে অংশ সম্পন্ন করে তার চিহ্নিত চিকিৎসা দাও। ৩
- ঘ. 'X' যে জুরে আক্রান্ত সেই জীবাণুটিকে জীব ও জড়ের যোগসূত্র বলা হয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যাকটেরিয়ার কোষে ক্রোমোসোম বহির্ভূত গোলাকার স্বতন্ত্র DNA ই হলো প্লাজমিড।

খ. ভাইরাস কোনো পোষক কোষ আক্রমণের সময় পোষক কোষে বংশগতীয় বস্তু প্রবেশের পর ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে পারে। পোষক কোষ ভেঙে যখন অনেকগুলো ভিরিয়ন মুক্ত হয় তখন সেই অবস্থাকে ভাইরাসের লাইটিক চৰ্ক বলে। যেমন— *E.coli* কে আক্রমণকারী T_1 ফায় ভাইরাসে লাইটিক চৰ্ক সম্পন্ন হয়।

গ. উদ্বিগকে উল্লিখিত 'Y' ম্যালেরিয়া জুরে আক্রান্ত। মশকীর ক্রপের ভিতর গ্যামিট সৃষ্টির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর যৌন প্রজনন সম্পন্ন হয়, যাকে গামিটোগনি বলে। মশকীর ক্রপের ভিতর ম্যালেরিয়া জীবাণু যে যৌন প্রজনন বা গ্যামিটোগনি সম্পন্ন করে তার চিহ্নিত চিকিৎসা নিম্নে দেওয়া হলো—



চিকিৎসা: মশকীর ক্রপের ভিতর *Plasmodium*-এর গ্যামিটোগনি

ঘ. উদ্বিগকে উল্লিখিত 'X' জেজু জুরে আক্রান্ত। জেজু একটি ভাইরাসধারিত রোগ। ভাইরাস অতি আণুবীক্ষণিক অকোষীয় বস্তু যা প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত। ভাইরাসের মধ্যে জীবীয় এবং জড় উভয় বৈশিষ্ট্যই লক করা যায়। ভাইরাস সজীব কোষের অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে, পাশাপাশি এদের মধ্যে প্রকরণ সৃষ্টি ও পরিবাণি ঘটতেও দেখা যায়। এসব জীবীয় বৈশিষ্ট্য। আবার, সজীব কোষের বাইরে ভাইরাস কোনো জৈবিক কার্যকলাপ ঘটাতে পারে না এবং এদের কোনো সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস, বিপাকীয় এনজাইম কিছুই থাকে না— যেগুলো জড় বৈশিষ্ট্য। জীব ও জড় উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্য ভাইরাসে পরিলক্ষিত হয় বলেই ভাইরাসকে জীব ও জড়ের যোগসূত্র বলা হয়।

প্রমাণ-১২ জীববিজ্ঞান ক্লাসে জামী শিখেছে যে কিছু আদিকেন্দ্রিক আণুবীক্ষণিক অণুজীব আছে যাদের দেহে বংশগতীয় উপাদান ছাড়াও বৃত্তাকার DNA থাকে এবং এদের অনেকেই অচলন জন্য উপকারী। এছাড়া আরেক ধরনের অণুজীব আছে যার অক্রম্যান্ত এবং অন্যান্য জীবের অতিসাধন করে।

- ক. কলেরা জীবাণুর বৈজ্ঞানিক নাম কেন্দ্ৰ? ১
- খ. মেরোজাইগোট বলতে কী বৰ্তু? ২
- গ. দ্বিতীয় অণুজীবটি প্রথম উল্টুইবৰ্তু ব্যবহাৰ কৰে কিভাৱে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় তা বলা কৰা দৰ্শক? ৩
- ঘ. জীবজগতে অণুজীব উল্টুই উপকাৰী দিক বিশ্লেষণ কৰো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কলেরা জীবাণুর বৈজ্ঞানিক নাম— *Vibrio cholerae*.

খ. কতিপয় ব্যাকটেরিয়া রোগ কলের সময় দাতা কোষের আংশিক ক্রোমোসোমের সাথৈ প্রোটোপ্লাজম সম্পূর্ণ ক্রোমোসোমের মিলনের মাধ্যমে যে জাইগোট প্রোটোপ্লাজম হচ তাই মেরোজাইগোট। প্রকৃতকোষী জাইগোটের মতো এটি উচ্চৰ তাৰ না এবং এতে কোনো সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না।

গ. উদ্বিগকের প্রথম অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া এবং দ্বিতীয় অণুজীবটি হলো ভাইরাস কিন্তু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ব্যাকটেরিয়া কোষের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। যেমন— 'Y' ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে। এর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ কৰা যায়—

উভয়ের বাকি অংশ সূজনশীল ৫ এর 'Y' প্রয়োজন দিয়ে।

ঘ জীবজগতে অণুজীব দৃষ্টি অর্থাৎ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের বিভিন্ন উপকারি দিক রয়েছে। এর মধ্যে ভাইরাস দিয়ে বসন্ত, পোলিও, ফ্লেগ, জিভিস ও জলাতঙ্গ রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয়। কতিপয় ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমনেও ভাইরাসের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। লাল টিউলিপ ফুলে ভাইরাস আক্রমণের ফলে বর্ণবেচিত্য সৃষ্টি হয়, এর ফলে ফুলের সৌন্দর্য এবং বাজারমূল্য বৃদ্ধি পায়।

আবার বিভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ব্যাকটেরিয়া থেকে পেয়ে থাকি। কলেরা, টাইফয়েড, যজ্ঞা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি করা হয়। কিছু ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। দুধ থেকে পনির, দই, মাখন, ছানা তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়া প্রয়োজন হয়। পাটের আঁশ ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চা, কফি ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত এনজাইমের প্রয়োজন হয়।

প্রথা ১৫ রফিকের জুর। ডাক্তার তার রক্ত পরীক্ষা করে বললেন, জুরের কারণ মশকী বাহিত এক কোষী জীব যা মানুষের যত্নত কোষ ও লোহিত কণিকা ধ্বংস করে।

/ষ বো. ২০১৬/

- ক. লাইকেন কী? ১
- খ. ব্যাকটেরিওফায় বলতে কী বোঝ? ২
- গ. উদ্বীপকের রোগের জীবাণুর নাম ও রোগ লক্ষণ লেখো। ৩
- ঘ. রফিকের জুরের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শৈবাল ও ছত্রাক মিলিতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের যে উত্তিদের সৃষ্টি করে তা হলো লাইকেন।

খ যেসব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে তাদেরকে বলা হয় ব্যাকটেরিওফায়। ফায় এর জেনেটিক বন্তু ব্যাকটেরিয়ামের দেহে প্রবেশ করে এবং এক সময় ব্যাকটেরিয়া কোষটি ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন : T₂-ব্যাকটেরিওফায় E. coli- কে আক্রমণ করে বংশবৃদ্ধি করে।

গ উদ্বীপকে উল্লিখিত রফিক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত। ম্যালেরিয়া একটি মশকীবাহিত রোগ। এই রোগের জীবাণুর নাম Plasmodium vivax.

ম্যালেরিয়া রোগ হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়—
প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাধুরা, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা ইত্যাদি দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীর শীত অনুভূত হয় এবং কাঁপনি দিয়ে জুর আসে। জুর ১০৫°-১০৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। কয়েক ঘণ্টা পর জুর কমে যায়। তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর দেহে জীবাণুর সংখ্যা অসম্ভবভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে হৃত রক্তের লোহিত কণিকা ভাঙতে থাকে। রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, প্লাশ্মা ও মন্তিস্ক আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ঘ রফিক ম্যালেরিয়া জুরে আক্রান্ত। ধারণা করা হতো যে প্রজীবীর দেহ থেকে নিঃসৃত হিমোজেন নামক বিষাক্ত রঞ্জক পদার্থের কারণে বা কোনো বিষবন্তু ক্ষরণের ফলে মানুষের দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং জুর আসে। কিছু বর্তমান ধারণা অনুযায়ী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষের দেহের লোহিত রক্ত কণিকার প্রাচীর ভেঙে মেরোজয়েটগুলো রক্তরসে প্রবেশ করে। মেরোজয়েটগুলো বহিরাগত বন্তু যা রক্তের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে দেয়। এ বহিরাগত বন্তুগুলোকে ধ্বংস করার জন্য রক্তের খেতকণিকা পাইরোজেন নামক এক প্রকার পদার্থ ক্ষরণ করে। খেতকণিকা যখন অতিরিক্ত পাইরোজেন ক্ষরণ করে তখন মন্তিস্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ, বিশেষ করে তাপসংবেদী কোষগুলো উদ্বৃত্ত হয়। তখন প্রেস্টায়াডিন, মনোঅ্যামাইন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ বেড়িয়ে আসে। এ খবর হাইপোথ্যালামাসের পেছন দিকটায় পৌঁছালে ডেসোমোটর মানুষের উত্তেজিত হয়। এ উত্তেজনা দেহের প্রাণীয় অঞ্চলের রক্তনালিগুলোকে সংকুচিত করে ফলে দেহ থেকে

অতিরিক্ত তাপ বের হতে পারে না। এ কারণেই দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। দেহের এ তাপ বৃদ্ধিকে জুর বলে। ঠিক এ কারণেই রফিকের শরীরে জুর আসে।

প্রথা ১৬ রনি ও মনি পরীক্ষা শেষে শহরে মামাৰ বাড়তে বেড়াতে গেলে সপ্তাহখানেক পর দেখা গেল রনির প্রচণ্ড জুরসহ শরীরে লালচে রজের র্যাশ এবং মনির বমিসহ চালধোয়া পানিৰ মত মল ত্যাগ কৰার লক্ষণ দেখা দিল।

বি. বো. ২০১০/

- | | |
|--|---|
| ক. জেনেটিক কোড কী? | ১ |
| খ. সাইকাসের মূলকে কোরালয়েড মূল বলা হয় কেন? | ২ |
| গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত রনি ও মনির রোগের নাম উল্লেখসহ রোগ নিয়ন্ত্রণে ডাক্তারের পরামর্শগুলো লেখো। | ৩ |
| ঘ. উভয়ের রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবেশীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিউক্লিওটাইড বা নাইট্রোজেন বেসের যে গ্রুপ কোন অ্যামিনো অ্যাসিডের সংকেত গঠন করে তাই হলো বংশগতীয় সংকেত বা জেনেটিক কোড।

খ সাইকাস উত্তিদের প্রধান মূল স্বল্পস্থায়ী। সে কারণে গোড়ায় অস্থানিক মূল সৃষ্টি হয়। অস্থানিক মূল থেকে কিছু শাখামূল মাটির উপরের দিকে উঠে আসে এবং খুব ঘনভাবে দ্ব্যাগ্র শাখা বিন্যাস গড়ে তোলে। মূলগুলো এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া হারা আক্রান্ত হয়। এ হারা সেখানে Nostoc, Anabaena নামক সায়ানোব্যাকটেরিয়া হারা আক্রান্ত হয়ে কোরালের মতো দেখায়। তাই সাইকাসের মূলকে কোরালয়েড মূল বলা হয়।

গ উদ্বীপকে উল্লিখিত রনি ডেজ্যু জুরে এবং মনি কলেরা রোগে আক্রান্ত। রনির রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ হবে—
এ রোগে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকায় অ্যাসপিরিন জাতীয় ওধূ পরিহার করা। রক্তের সাম্যতা রক্ষার জন্য প্লাটিলেট ট্রান্সফিউশন বা রক্তদান। জুরের তীব্রতায় রোগীর মাথায় পানি দেয়। রনিকে প্রচুর পরিমাণ পানি ও তরল খাবার খেতে দেয়। রোগীর অবস্থা জটিল হলে অবশ্যই হাসপাতালে নিতে হবে।

মনির রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ হবে—
মনিকে খাবার স্যালাইন বা ওরাল স্যালাইন বার বার পান করানো। এতে রোগী ডিহাইড্রেশনে আক্রান্ত হয় না এবং দ্রুত রোগ নিরাময় ঘটে। মনি মুখে খাবার স্যালাইন খেতে না পারলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে শিরায় স্যালাইন দেয়। তাকে প্রচুর তরল খাবার খেতে দেয়। তাকে বিশ্রামে রাখা। এছাড়া ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক মনিকে দেয়া যেতে পারে।

ঘ রনি ও মনির রোগলক্ষণ বিবেচনা করলে বোৰা যায় যে, রনি ডেজ্যু ও মনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। উভয়ের রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবেশের অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

ডেজ্যু রোগ বিস্তারে পরিবেশীয় গুরুত্ব: ডেজ্যু একটি ভাইরাসজনিত রোগ। এডিস প্রজাতির মশকী ডেজ্যু ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে ও সংক্রমণ ঘটায়। আবস্থ পরিষ্কার পানিতে এডিস মশাৰ বংশবিস্তার ঘটে। পরিযোগ টায়ার, ফুলের টব, এয়ার কুলার বা ফ্রিজের নিচের অংশ, ভাজা কাচ বা মাটির পাত্র প্রভৃতি, যেখানে পানি বেশ কয়েকদিন আবস্থ থাকে এমন স্থানে এডিস মশা বসবাস করে। ডেজ্যু সংক্রমিত এডিস মশা মানুষকে দংশন করলে মশকীৰ লালার সাথে জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে। তাই পরিবেশে এডিস মশা বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ বেশ কিছুদিন আবস্থ পরিষ্কার পানি কোথাও জমে থাকলে তা ডেজ্যু রোগ বিস্তারে অনুকূল ভূমিকা পালন করে।

কলেরা রোগ বিস্তারে পরিবেশীয় গুরুত্ব: কলেরা একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। কলেরা জীবাণু হারা দৃষ্টিত খাবার অথবা পানি প্রহণ করলে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়। রোগীর মলমৃত্তের মাধ্যমেও এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। যেসব অঞ্চলের রক্তনালিগুলোকে সংকুচিত করে ফলে দেহ থেকে

থাবার পানির যথাযথ ব্যবস্থা নেই সেসব অঞ্চলে কলেরা দুটি বিস্তার লাভ করে থাকে। সমন্বয় উপকূলীয় অঞ্চল এবং নোনাপানির নদ-নদীতে কলেরার জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে। এছাড়া কঠিনাস্পিতি মাছ, কাকড়া, খিনুক, শামুক ও চিংড়ির মধ্যেও কলেরা জীবাণু বেঁচে থাকে এবং তা কলেরার উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। সাধারণত আক্রান্ত রোগীর মল, দৃশ্যত পানি এবং খাদ্যের মাধ্যমে কলেরা জীবাণুর প্রাথমিক সংক্রমণ ঘটে। কলেরা রোগীর বমি, বিছানাপত্র, পানি, খাদ্য ও মাছি দ্বারা রোগের গৌণ সংক্রমণ ঘটে। তাই কলেরা রোগের বিস্তারের ক্ষেত্রেও পরিবেশীয় গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৫ একটি জীবাণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি তাদের জীবনচক্রের আবশ্যিক কিছু পর্যায় সম্পন্ন করতে গিয়ে মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীতে একটি রোগের সৃষ্টি করে এবং একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মশকীর মাধ্যমে রোগটি ছড়ায়।

- | | |
|---|---|
| ক. পাম ফার্ন কী? | ১ |
| খ. ক্যারিওগ্যামী বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. উক্ত জীবাণুটির স্পেরের বর্ণনা দাও যা প্রথমোন্ত জীবকে আক্রমণ করে। | ৩ |
| ঘ. উক্ত রোগটির জীবাণুর জীবনচক্র শেষোন্ত জীবটি ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়—বিশেষণ করো। | ৪ |

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাম উক্তিদ ও ফার্নের পাতার সাথে সাইকাসের পাতা কিছুটা মিলসম্পন্ন হওয়ায় অনেক সময় সাইকাস উক্তিদকে পাম ফার্ন বলা হয়।

খ যৌন জননের ক্ষেত্রে দুটি হ্যাপ্সয়েড আদিকোষী জনন কোষের মিলনের শেষ ধাপ হলো ক্যারিওগ্যামী যেখানে জনন কোষ দুটির নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে। গ্যামিট বা জনন কোষ সৃষ্টির পর প্রোটোপ্লাজমের মিলন ঘটে তারপর নিউক্লিয়াসের মিলনের মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন হয়। ছাড়াকে এ ধরনের যৌন জনন দেখা যায়।

গ উক্ত জীবাণুটি হলো প্লাজমোডিয়াম। প্লাজমোডিয়ামের স্পেরেজয়েট দশা প্রথমোন্ত জীব অর্থাৎ মানুষকে আক্রমণ করে।

মানবদেহে স্পেরেজয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সপ্তাহে প্রিএরিশ্রেসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এতে স্পেরেজয়েট, ক্রিন্টোজয়েট, সাইজন্ট ও ক্রিন্টোমেরোজয়েট ধাপগুলো দেখা যায়। স্পেরেজয়েটগুলো রক্তস্তর থেকে যকৃত কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যকৃত কোষ থেকে খাদ্য প্রাপ্ত করে স্পেরেজয়েটগুলো গোলাকার ক্রিন্টোজয়েটে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্রিন্টোজয়েট ক্রমাগত নিউক্লিয়াস বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইজন্ট দশায় উপনীত হয়। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় যা ক্রিন্টোমেরোজয়েট নামে পরিচিত। পরিণত ক্রিন্টোমেরোজয়েটগুলো সাইজন্টের প্রাচীর বিনীপ করে যকৃতের সাইন্সয়েড এ আশ্রয় নেয়।

এভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবী নিপার যকৃতে প্রিএরিশ্রেসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্নের পর উৎপন্ন মেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃতকোষকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সাইজন্ট দশায় পৌছায়। সাইজন্ট দশা থেকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই বিভিন্ন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হওয়ার মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয়, যাদেরকে মেটাক্রিন্টোমেরোজয়েট বলে।

ঘ উদ্বীপকে নির্দেশিত রোগটি হলো ম্যালেরিয়া জ্বর এবং শেষোন্ত জীবটি ম্যালেরিয়া জীবাণুর বাহক ও পোষক *Anopheles* গণের মশকী। ম্যালেরিয়া *Plasmodium* পরজীবীর আক্রমণে হয়ে থাকে। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু *Plasmodium* এর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে অবশ্যই মানুষের দেহ এবং মশকী প্রয়োজন। কারণ জীবন চক্রের যৌন দশাটি মশকীর দেহে এবং অযৌন দশাটি মানুষের দেহে সম্পন্ন হয়।

এখনে মশকীর দেহে প্রথমে দু'প্রকার গ্যামিটেসাইট প্রবেশ করে দেখানে তারা মিলিত হয়ে জাইগোট উৎপন্ন করে। জাইগোটটি শেষে মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে স্পেরেজয়েট উৎপন্ন করে। উৎপন্ন

স্পেরেজয়েট পুনরায় মশকীর দেহে আক্রমণ করে না বরং মানুষের দেহে চলে আসে। এরপর স্পেরেজয়েট প্রথমে যকৃত কোষ ও পরে লোহিত রক্তকণিকা পরজীবী শুধুমাত্র অযৌন চক্রের মাধ্যমে বারবার সাইজোগনি সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু যৌন চক্রের জন্য অবশ্যই মশকী প্রয়োজন। সুতরাং আলোচনা থেকে সুপ্রস্তুতভাবে বুঝা, যায় যে উক্ত জীবাণুর জীবনচক্র শেষোন্ত জীব অর্থাৎ মশকী ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ স্বী *Anopheles* মশকী সুনির্দিষ্ট পরজীবীর গ্যামিটেসাইট ধর্মসের জন্য কোনো এনজাইম থাকে না, যা মানুষের দেহে নির্দিষ্ট সময় পর পর জ্বর আসার জন্য দায়ী।

- | | |
|--|---|
| ক. মাধ্যমিক পোষক কী? | ১ |
| খ. এনজাইমের ক্রিয়া প্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. উদ্বীপকের পরজীবী মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় উপস্থিত থাকলে কী ঘটবে? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্বীপকের রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিশেষণ করো। | ৪ |

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব পোষকের দেহে অযৌন জনন সম্পন্ন হয় এবং লার্ভা দশা অতিক্রান্ত হয়, সেসব পোষকই হলো মাধ্যমিক পোষক।

খ কোনো নির্দিষ্ট এনজাইমের এক বা একাধিক সক্রিয় স্থান থাকে। পলিপেপটাইড চেইনের ফলডিং-এর মাধ্যমে অ্যাকটিভ সাইট সৃষ্টি হয়। অ্যাকটিভ সাইট ও সাবস্ট্রেটের সম্পর্ক হলো তালা-চাবির মতো সুনির্দিষ্ট। একেতে প্রথমে সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সক্রিয় স্থান তথা 'অ্যাকটিভ সাইট'-এ সংযুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যোগ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যোগ ভেঙে গিয়ে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং এনজাইম অপরিবর্তিতভাবে পৃথক হয়ে যায়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এনজাইমের অ্যাকটিভ সাইট-এ সাবস্ট্রেট সঠিকভাবে 'fit' হয় না। এসব ক্ষেত্রে সাবস্ট্রেট অ্যাকটিভ সাইট-এ সংযুক্ত হলো পুরো এনজাইমের আকার পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এনজাইম সাবস্ট্রেটকে সঠিকভাবে অ্যাকটিভ সাইট-এ 'fit' করে নেয়। একে বলা হয় 'induced fit'। এনজাইম-সাবস্ট্রেট এর কার্যকরী শক্তি কম। তাই কম কার্যকরী শক্তিসম্পন্ন সাবস্ট্রেট অণু এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে এনজাইম-সাবস্ট্রেট যোগ সৃষ্টি করে, ফলে বিক্রিয়ার হার বেড়ে যায়।

গ উদ্বীপকের পরজীবীটি হলো ম্যালেরিয়ার জীবাণু। অণুজীবী মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় উপস্থিত থেকে তার জীবনচক্র সম্পন্ন করে, যাকে এরিশ্রেসাইটিক সাইজোগনি বলে।

মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় এর জীবনচক্রের ধাপগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো:

১. যকৃত কোষে সৃষ্টি মেটাক্রিন্টোমেরোজয়েট লোহিত রক্তকণিকায় প্রবেশ করে এবং খাদ্য প্রাপ্ত করে স্ফীত ও গোলাকার হয়। এই দশাকে ট্রফোজয়েট বলে।
২. প্রবর্তীতে অণুজীবীটি আংটি আকৃতি লাভ করে। এই অবস্থাকে সিগনেট রিং দশা বলে। এই অবস্থায় জীবাণু কোষের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম এক নিকে থাকে।
৩. এই অবস্থাতে জীবাণু অ্যামিবয়েড আকৃতি প্রাপ্ত হয়ে অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েট নশ সৃষ্টি করে।
৪. অ্যামিবয়েড নশের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস বারবার বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে এবং বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এই অবস্থাকে সাইজন্ট নশ বলা হয়।
৫. সাইজন্ট নশের প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমামেনসহ মেরোজয়েট এ পরিণত হয়। এই দশাকে বেজেট নশ বলে। মেরোজয়েটগুলো এমনভাবে সজ্জিত হয় যেন একটি ফুটস্ট ফুল।

৬. প্রবর্তীতে লোহিত রক্তকণিকা কোষ ভেঙে যায় এবং মেরোজয়েটগুলো প্লাজমায় বের হয়ে আসে। মেরোজয়েটগুলো রক্তপ্রাতে চুকে গেলে খেতে রক্তকণিকা প্রতিরোধের চেষ্টা করে এতে প্রচুর পাইরোজেন নামক রাসায়নিক পদার্থ জমা হয় এবং এর প্রভাবেই ঝুঁতু আসে।

৭. মুক্ত মেরোজয়েট নতুন লোহিত কণাকে আক্রমণ করে এবং একইভাবে চেষ্টা পূরণ করে।

য উদ্দীপকে বর্ণিত রোগটি হলো ম্যালেরিয়া। এ রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো—
প্রতিকার ব্যবস্থা: ম্যালেরিয়া যেহেতু মশকী বাহিত একটি রোগ তাই মশকী প্রতিরোধের মাধ্যমে এ রোগ হতে মুক্ত থাকা সম্ভব। ম্যালেরিয়া প্রতিকার ২ ভাগে হতে পারে; যথা— (ক) মশকী নিষ্ফল, (খ) মশকী হতে আস্তরক্ষা।

(ক) মশকী নিষ্ফল: মশকুলের বৎস পরিবেশ হতে নির্মূল করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করে এদের বিস্তার রোধ করা যায়—

(i) প্রজননক্রেত্র ধ্বংস: মশকীরা বন্ধ পচা পানিতে ডিম পাড়ে। তাই বাড়ির আশেপাশের পরিত্যক্ত ডোবা, নালা পরিষ্কার রাখা, যেখানে সেখানে পানি জমতে না দেয়া, বাড়ির আশেপাশের বোপ-ঝাড়, জঙ্গল কেটে ফেলার মাধ্যমে মশকীর বসবাস ও প্রজননক্রেত্র ধ্বংস করা সম্ভব।

(ii) লার্ড ও পিউপা ধ্বংস করা: পচা পানিতে ডিম ফুটে মশকীর লার্ড ও পিউপা দশা সৃষ্টি হয়। পানিতে কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় পদার্থ ছিটিয়ে দিলে এরা অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়ে। এছাড়া বিএইচসি (BHC), ডায়েলিন ইত্যাদি কাইটনাশক পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর লার্ড ও পিউপা মারা যায়। পানিতে জুড়েনাইল হরমোন ছিটিয়ে দিলে, লার্ডগুলোর বৃপ্তান্ত ব্যাহত হয় ফলে এরা পূর্ণাঙ্গ মশকীতে বৃপ্তান্তরিত হতে পারে না।

(iii) পূর্ণাঙ্গ মশকুল নিষ্ফল: ফগিং মেশিনের মাধ্যমে সালফার ডাই-অক্সাইডের ধোয়া সৃষ্টি করে মশা তাড়ানো বা মেরে ফেলা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ছিটিয়ে বা রেডিয়েশন এর মাধ্যমে বন্ধ্যাত্মক সৃষ্টি করে মশকুলকে ধ্বংস করা যায়।

(খ) মশকী হতে আস্তরক্ষা: ঘরের দরজা বা জানালায় মশকীরেধী নেট ব্যবহার করে মশকীর দংশন হতে আস্তরক্ষা করা যায়। এছাড়া কয়েল বা বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ব্যবহার করা বা দেহের অন্তর্বৃত অংশে বিশেষ ধরনের ক্রিম বা লোশন লাগানোর মাধ্যমে মশকীর দংশন হতে বাঁচা যায়। শয়নের সময় মশার ব্যবহার করতে হবে। সন্ধ্যায় ধূপের ধোয়া প্রয়োগ করা যায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা: ম্যালেরিয়া রোগীকে অবশ্যই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করা আবশ্যিক। রোগ শনাক্ত করা ও উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করলে ম্যালেরিয়া রোগ হতে পরিত্যান পাওয়া যায়। সিনকোনা গাছের বাকল হতে তৈরি কুইনাইন ম্যালেরিয়া নিরাময়ের মূল ঔষধ। এ কুইনাইন দ্বারাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ তৈরি হয়েছে। যেমন—ক্লোরুকুইন, নিভাকুইন, কেমোকুইন, অ্যাভলোকোর, প্যালাট্রিন ইত্যাদিসহ ম্যালেরিয়া পরজীবী ধ্বংসের ভালো মানের বেশ কিছু ঔষধ বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়া আক্রান্ত রোগীকে যাতে মশকী দংশন করতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যিক, নতুন বৃত্ত রোগের বিস্তার ঘটতে পারে।

প্রশ্ন ► ১৭. ম্যালেরিয়ার জীবাণুর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে একটি মেরুদণ্ডী এবং একটি অমেরুদণ্ডী পোষকের প্রয়োজন। /পরমা ক্যাটেট জলজ/

- ক. প্লাইকোলাইসিস কী? ১
 খ. C_3 চক্র এবং C_4 চক্রের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২
 গ. উদ্দীপকের পরজীবীর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের পরজীবী অমেরুদণ্ডী পোষকের মধ্যে কীভাবে তার গ্যামিটোগনি দশা সম্পন্ন করে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

ক ষে প্রক্রিয়ায় এক অণু প্লকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয় তাই প্লাইকোলাইসিস।

ব C_3 ও C_4 চক্রের পার্থক্য—

C_3 চক্র	C_4 চক্র
i. রাইবুলোজ ১, ৫-বিসফসফেট হলো CO_2 -এর প্রথম গ্রাহক।	i. ফসফেইনল পাইরুভিক এসিড হলো CO_2 -এর প্রথম গ্রাহক।
ii. প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৩-কার্বনবিশিষ্ট ৩-ফসফেইনসারিক এসিড।	ii. প্রথম স্থায়ী পদার্থ ৪-কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো এসিটিক এসিড।
iii. অধিক আলোর প্রয়োজন C_3 চক্র চলে না।	iii. অধিক আলোর প্রয়োজন C_4 চক্র চলতে পারে।
iv. C_3 চক্রের জন্য পরম তাপমাত্রা হলো 10° — 25° সে।	iv. C_4 চক্রের জন্য পরম তাপমাত্রা হলো 30° — 45° সে।

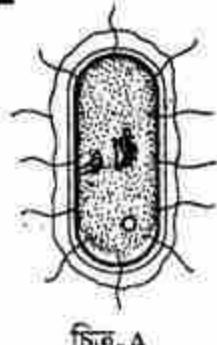
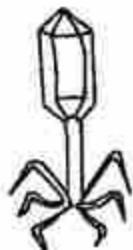
গ উদ্দীপকের পরজীবীর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজন হয়। পোষক দুটি হলো মানুষের দেহ এবং মশকী। কারণ জীবনচক্রের যৌন দশাটি মশকীর দেহে এবং অযৌন দশাটি মানুষের দেহে সম্পন্ন হয়।

মশকীর দেহে প্রথমে দুপ্রকার গ্যামিটোসাইট প্রবেশ করে, এরপর তারা মিলিত হয়ে জাইগোট উৎপন্ন করে। জাইগোটটি মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে স্পোরোজয়েট উৎপন্ন করে। উৎপন্ন স্পোরোজয়েট পুনরায় মশকীর দেহে আক্রমণ না করে মানুষের দেহে চলে আসে। এরপর স্পোরোজয়েট প্রথমে মানুষের যকৃত কোষ ও পরে লোহিত রক্তকণিকা আক্রমণ করে এবং সেখানে অযৌন জনন ঘটায়। তবে মানুষের দেহে পরজীবী শুধু অযৌন চক্রের মাধ্যমেই বারবার সাইজেগনি সম্পন্ন করতে পারে এবং যৌন চক্রের জন্য অবশ্যই মশকী প্রয়োজন।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পরজীবীটির জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে দুটি পোষক আবশ্যিক।

ঘ উদ্দীপকের পরজীবী অমেরুদণ্ডী পোষক তথা মশকীর মধ্যে যত্নভাবে তার গ্যামিটোগনি দশা সম্পন্ন করে তার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো—
মশকীর ক্রপের অভ্যন্তরে গ্যামিট সৃষ্টির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর যৌন প্রজননকে গ্যামিটোগনি বলে। গ্যামিটোগনি তিনি ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়। এর প্রথম ধাপ হলো গ্যামিট বা জননকোষ সৃষ্টি বা গ্যামিটোজেনেসিস। গ্যামিটোজেনেসিস দুই প্রকার। যথা—স্পার্মাটোজেনেসিস এবং উওজেনেসিস। স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার প্রথমে মাইক্রোগ্যামিটোসাইটের নিউক্লিয়াসটি বিভক্ত হয়ে $8-8$ টি ক্ষুদ্রাকার নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। এ সময় জীবাণু কয়েকটি কোণা বিশিষ্ট হয়। প্রতিটি কোণার মধ্যে একটি করে ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস প্রক্রিয়া করে এবং নিউক্লিয়াসের চারদিকে সাইটোপ্লাজম জমা হয়। এর পরপর জীবাণুর দেহটি মাইক্রোগ্যামিটে বা শুক্রাণুতে পরিণত হয়। আবার উওজেনেসিস প্রক্রিয়ার প্রথমে প্রতিটি ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট-এর নিউক্লিয়াস বিভক্ত হয়ে ম্যাক্রোগ্যামিটে বা ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। গ্যামিটোগনির দ্বিতীয় ধাপ নিষেক ও জাইগোট সৃষ্টি। এ ধাপে মুক্ত মাইক্রোগ্যামিটগুলো পৃথক পৃথকভাবে ম্যাক্রোগ্যামিটে বা ডিম্বাণুর দিকে অগ্রসর হয়। প্রতিটা ডিম্বাণুতে একটি করে শুক্রাণু প্রবেশ করে নিষেক সম্পন্ন হয়ে গোলাকার জাইগোট সৃষ্টি হয়। গ্যামিটোগনির শেষ ধাপ উওকিনেট গঠন। এ ধাপে গোলাকার নিশ্চল জাইগোটটি সচল হয় এবং কিছুটা লম্বাকৃতি ধারণ করে উওকিনেটে পরিণত হয়। উওকিনেট এরপর মশকীর ক্রপের প্রাচীরে ভেদ করে প্রাচীরের বাইরের গায়ে সংলগ্ন হয় এবং সিস্ট আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে গোলাকার উওসিনেটে পরিণত হয়।

এভাবে ম্যালেরিয়ার পরজীবী মশকীর অভ্যন্তরে গ্যামিটোগনি দশা সম্পন্ন করে।

চিত্র-**A**চিত্র-**B**
/পাদবা ভাস্তো কলজ/

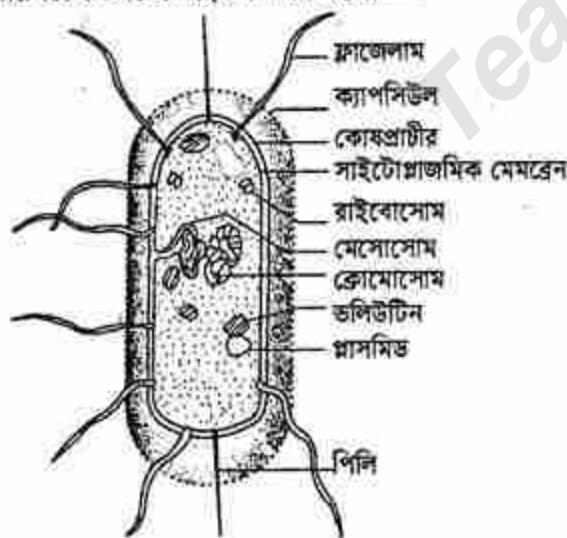
- ক. কনজুগেশন কী? ১
 খ. ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মানুষে কেন অ্যানিমিয়া দেখা যায়? ২
 গ. উদ্বীপকের চিত্র A-এর চিহ্নিত চিত্র আঁক। ৩
 ঘ. উপরের 'A' অঙ্গাণু ব্যবহার করে 'B' কীভাবে বংশবৃদ্ধি করে? ৪
 ব্যাখ্যা করো।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে যৌন জনন পদ্ধতিতে পাশাপাশি দুটি কোষের মধ্যে কনজুগেশন টিউব তৈরি হয় এবং এই টিউবের মাধ্যমে পুঁগ্যামিট স্তীগ্যামিটের সাথে মিলিত হয় তাই কনজুগেশন।

খ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মানুষে অ্যানিমিয়া বা রক্তস্ফন্দতা দেখা যায়, তার শরীরে লোহিত রক্তকণিকা কমে যাওয়ার কারণে। কোনো সুস্থ মানুষ রোগজীবাণুবাহী এনোফিলিস মশকী দ্বারা দখিত হলে মশকীর লালার সাথে রোগ জীবাণুর স্পেপোরোজোয়েট তার দেহে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে ম্যালেরিয়ার অযৌন জনন প্রক্রিয়ার হেপাটিক সাইজোগনির পর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ে ম্যালেরিয়া জীবাণু লোহিত রক্তকণিকা আক্রমণ করে এবং সেখানে বংশবৃদ্ধি করে। লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে মেটাক্রিন্টোমেরোজয়েট হিমোগ্লোবিনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে লোহিত কণিকা ভেঙে মেরোজয়েট বেরিয়ে আসে এবং পুনরায় লোহিত কণিকা আক্রমণ করে। এভাবে মানবদেহে লোহিত রক্তকণিকার ভাঙ্গনের ফলে রক্তস্ফন্দতা বা অ্যানিমিয়া দেখা যায়।

গ উদ্বীপকের উল্লিখিত চিত্র A-হলো একটি ব্যাকটেরিয়া। নিচে ব্যাকটেরিয়ার চিহ্নিত চিত্র অংকন করা হলো—



চিত্র : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ

ঘ উদ্বীপকে উল্লিখিত 'B' অঙ্গাণু ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করার জন্য অঙ্গাণু 'A' অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করে।

ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো সজীব কোষের অভ্যন্তরে এরা বংশবৃদ্ধি করে। যেমন, T_2 ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার অভ্যন্তরে বংশবৃদ্ধি করে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো—
 সংক্ষমণ পর্যায়: ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্ত্র সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে

লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিন্ন হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তর্ভুক্ত হারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়: ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায়: ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, T_2 ফায় ভাইরাস সর্বদাই অন্যের সহায়তায় অর্থাৎ *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় বংশবিস্তারে সক্রম।

প্রশ্ন ▶ ১৯ A → অকোষীয় জীব, নিউক্লিয়াস প্রোটিন দ্বারা আবৃত।

B → এককোষীয় জীব, নিউক্লিয়াস আদিকেন্দ্রিক।

C → এমন জীব যা মানবদেহে অযৌন জনন এবং *Anopheles* মশকীতে যৌন জনন সম্পন্ন করে।

/জেপ্রোহাট গ্যাজেট কলজ/

ক কলেরা রোগের জীবাণু বৈজ্ঞানিক নাম লেখো। ১

খ. গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া বলতে কী বোঝায়? ২

গ. B কোষকে ধ্রংস করে A-এর সংখ্যা বৃদ্ধি বর্ণনা করো। ৩

ঘ. কীভাবে C জীবটি মানবদেহের যকৃতে অযৌন জনন সম্পন্ন করে তা আলোচনা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কলেরা রোগের জীবাণু হলো *Vibrio cholerae* নামক ব্যাকটেরিয়া।

খ ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাসের জন্য একটি রঞ্জন পদ্ধতি রয়েছে যাকে গ্রাম রঞ্জন পদ্ধতি বলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া মিয়ার নিয়ে তাতে ক্লিটল ভায়োলেট রং দেয়া হয়, এরপর আয়োডিন দেওয়া হয়। এরপর এটি অ্যালকোহলে ধূয়ে স্যাফ্রানিনের লাল রং এ কাউন্টার স্টেইন করা হয়। যে সব ব্যাকটেরিয়া ভায়োলেট রং ধরে রাখবে তাদেরকে বলা হয় গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া।

গ উদ্বীপকে A হলো ভাইরাস এবং B হলো ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিওফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষকে ধ্রংস করে সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

যে সকল ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ধ্রংস করে তাদের ব্যাকটেরিওফায় বলে। T_2 ব্যাকটেরিওফায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াকে (*E. coli*) আক্রমণ করে এবং তাদের দেহাভ্যন্তরে সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্রংস করে থাকে।

ব্যাকটেরিওফায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। T_2 ব্যাকটেরিওফায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথমে *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরে এনজাইমের কার্যকারিতায় ব্যাকটেরিয়ামের প্রাচীরে ছিন্ন তৈরির মাধ্যমে ফায় DNA ব্যাকটেরিয়াম কোষে প্রবেশ করায়। ব্যাকটেরিয়াম কোষের অভ্যন্তরে অসংখ্য ফায় DNA এবং ফায় কোটি প্রোটিন তৈরি হয়। ফায় কোটি প্রোটিন পরবর্তীতে নতুন ফায়ের মাথা, লেজ, স্পর্শকতন্ত্র ও স্পাইক তৈরি করে। এরপর অপত্য ফায় DNA এবং অন্যান্য প্রোটিন অংশগুলো যুক্ত হয়ে অসংখ্য নতুন T_2 ফায় তৈরি হয়। সবশেষে ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর বিগলনের মাধ্যমে অপত্য T_2 ব্যাকটেরিওফায়গুলো বাইরে বের হয়ে আসে। এভাবে T_2 ফায় তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে।

ঘ উদ্বীপকে C হলো ম্যালেরিয়া পরজীবী প্লাজমোডিয়াম যা মানবদেহে ম্যালেরিয়া জ্বর সৃষ্টি করে।

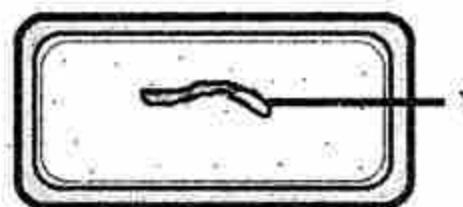
এ পরজীবীটি মানবদেহের যকৃতে হেপাটিক সাইজেগনি সম্পন্ন করে। মানবদেহে ম্যালরিয়া জীবাণুর স্পেরোজয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সম্ভাব্য প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এতে স্পেরোজয়েট, ক্রিস্টোজয়েট, সাইজন্ট ও ক্রিস্টোমেরোজয়েট এ ধাপগুলো দেখা যায়।

স্পেরোজয়েটগুলো রক্তস্তর থেকে যকৃত কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যকৃত কোষ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে স্পেরোজয়েটগুলো গোলাকার ক্রিস্টোজয়েটে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্রিস্টোজয়েট ক্রমাগত নিউক্লিয়াস বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইজন্ট দশায় উপনীত হয়। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় যা ক্রিস্টোমেরোজয়েট নামে পরিচিত। পরিণত ক্রিস্টোমেরোজয়েটগুলো সাইজন্টের প্রাচীর বিদীর্ঘ করে যকৃতের সাইন্সয়েডে আশ্রয় নেয়।

এভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবী যকৃতে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনি সম্পন্নের পর উৎপন্ন মেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্রো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনির সূচনা করে যা পরবর্তীতে সাইজন্ট দশায় পৌছায়। সাইজন্ট দশা থেকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই বিভক্ত নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হওয়ার মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় যাদেরকে মেটাক্রিস্টোমেরোজয়েট বলে। এগুলো আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ঘ করে বের হয়ে আসে।

এভাবেই ম্যালেরিয়া পরজীবী মানবদেহের যকৃতে জীবনকাল সম্পন্ন করে।

প্রশ্ন ▶ ২০



চিত্র : X

(বিপুর জ্বালাটে কলেজ)

- ক. নিউক্লিওটাইড কী? ১
- খ. জেনেটিক কোড বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. 'Y' চিহ্নিত অংশটি কীভাবে এই অবস্থায় পরিণত হয়-ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. চিত্র-X এর Y চিহ্নিত অংশটির হোমোজেনাস অবস্থার গুরুত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. এক অণু নিউক্লিওটাইড এর সাথে এক অণু ফসফেট যুক্ত হয়ে গঠিত যৌগ হলো নিউক্লিওটাইড।

খ. জিন বা DNA হতেই বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন সৃষ্টির নির্দেশ কয়েকটি বিশেষ সংকেতের মাধ্যমে mRNA দ্বারা পরিবেশিত হয়। এ সংকেতগুলোই জেনেটিক কোড। জেনেটিক কোড হয়ো প্রকৃতির অর্থাৎ একটি অ্যামিনো অ্যাসিড নির্দেশকারী কোড বা সংকেত তিনটি নাইট্রোজেনাস বেস থাকে এবং এ কোড সার্বজনীন অর্থাৎ জীবের গঠন ও ধরনভেদে জেনেটিক কোডের পরিবর্তন ঘটে না।

গ. উদ্দীপকের চিত্রিতে 'Y' চিহ্নিত অংশ দ্বারা ব্যাকটেরিয়ার মেরোজাইগোট অবস্থা বুঝানো হয়েছে।

সাধারণত যৌন জনন প্রক্রিয়ায় দুটি ব্যাকটেরিয়া কোষ একটি দাতা কোষ (+) এবং একটি প্রযুক্তা কোষ (-) একত্রে এসে পাশাপাশি অবস্থান করে। পরে দুটি পাশাপাশি অবস্থিত কোষের মিলিত প্রাচীরের একস্থানে কোষপ্রাচীর বিগলিত হয়ে একটি সংযোগ নালী সৃষ্টি করে। এই নালী পথে দাতাকোষের ক্রোমোসোম প্রযুক্তাকোষে প্রবেশ করতে থাকে। কিন্তু ক্রোমোসোমের আংশিক ক্রোমোসোম নিয়ে যে জাইগোট তৈরি করে তাকে

বলা হয় মেরোজাইগোট। এ প্রক্রিয়ায় কোনো সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না বরং দাতা কোষ আংশিক ক্রোমোসোম হারিয়ে অটি঱েই নষ্ট হয়ে যায়, ফলে সংখ্যাবৃদ্ধির পরিবর্তে সংখ্যা হ্রাস পায়।

ঘ. উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্র-X হলো হেটারোজেনাস ব্যাকটেরিয়া। যকৃত ব্যাকটেরিয়া হলো হোমোজেনাস। এখানে হোমোজেনাস ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিচে তা আলোচনা করা হলো —

i. ওষুধ শিরে : ব্যাকটেরিয়া থেকে সাবটিলিন, পলিমিক্রিন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাটিবায়োটিক ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। অ্যাক্টিনোমাইসিটিস জাতীয় ব্যাকটেরিয়া থেকে আমরা ট্রেপটোমাইসিন, টেরামাইসিন ইত্যাদি অ্যাটিবায়োটিক পেয়ে থাকি। আবার বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া থেকে কলেরা, যজ্ঞা, টাইফয়েড এবং ডিপথেরিয়া, হৃপিংকাশি, ধনুষ্টৎকার প্রভৃতি রোগের টিকা তৈরি হয়।

ii. কৃষিক্ষেত্রে : মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি: মৃত গাছপালা ও প্রাণিদেহ, গোবর কিংবা ময়লা আবর্জনার পঁচন, বিগলন ও পরিশেষে জৈব পদার্থ মাটির সাথে মিশিয়ে মাটিকে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ ও উর্বর করে তোলে।

iii. নাইট্রোজেন সংবন্ধন : *Azotobacter*, *Clostridium*, *Pseudomonas* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া বাতাসের গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি লবণে পরিণত করে এবং মাটির উর্বরতা বাড়ায়। শিম জাতীয় গাছের মুলে *Rhizobium* নড়িউল সৃষ্টি করে সেখানে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।

ফলন বৃদ্ধি : জমিতে কতিপয় ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে ধান ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

iv. শিরক্ষেত্রে :

- দুর্ঘ শিরে : *Streptococcus lactis*, *Lactobacillus* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় দুধ থেকে দই, মাখন, পনির, ঘোল, ছনা প্রভৃতি তৈরি করা হয়।
- পাট শিরে : *Clostridium* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে পাট পঁচিয়ে সেখান থেকে আশ পৃথক করা হয়।
- চামড়া শিরে : ট্যানারিতে চামড়া থেকে লোম পৃথক করা এবং চামড়াকে নমনীয় করতে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।
- চা, কফি ও তামাক শিরে: ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এর ফলে বিশেষ স্বাদ ও গন্ধের উৎপত্তি ঘটে।
- রাসায়নিক শিরে : *Clostridium acetobutylicum* নামক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে শর্করা হতে অ্যাসিটোন ও আলকোহল তৈরি হয়। *Acetobacter xylinum* এর সাহায্যে আলকোহল থেকে ভিনেগার এবং *Bacillus lacticacidi* দিয়ে ল্যাকটিক এসিড তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া থেকে ভিটামিন B₁, B₁₂ এবং সেলুলজ, প্রোটিয়েজ প্রভৃতি এনজাইম পাওয়া যায়। এমনকি রব্রন শিরের টেস্টিংস্টেল তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।

প্রশ্ন ▶ ২১ সোহান বিশুদ্ধ পানি পান করে না। একদিন সে প্রচল্ল ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হলো এবং বমি করতে লাগলো। তার দেহে পানি শূন্যতা দেখা দিলো।

/ক্রিয়া জ্বালাটে কলেজ/

- ক. ডেজু ভাইরাসের ভেষ্টির কোনটি? ১
- খ. ফায় কী? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. সোহানের রোগটির চিকিৎসা বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. যে ধরনের অণুজীব সোহানের রোগটির কারণ সেগুলো শুধু ক্রিটিকারকই নয়, কিন্তু কিন্তু আমাদের জন্য অত্যন্ত উপকারী—বিশেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ডেজু ভাইরাসের ভেষ্টির হলো- *Aedes aegypti* নামক মশকী।

১. ফায় একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ হলো ভক্ষণ করা। প্রকৃত অর্থে ফায় হলো এই সব ভাইরাস যারা জীবদেহে অবস্থিত রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্রংস করে। T₂ ভাইরাস একটি ফায়। কারণ এরা *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে ধ্রংস করে।

২. সোহানের লক্ষণগুলো দেখে বোৰা যায় তার কলেরা হয়েছে। এটি পানিবাহিত একটি মারাঞ্চক রোগ। এ রোগ হলে দুটি চিকিৎসা প্রয়োজন করা উচিত। কলেরার কার্যকর চিকিৎসা বেশ সহজ ও স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ। চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেসব রোগী মুখে খাবার গ্রহণে সম্মত তাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত খাবার স্যালাইন ঘনঘন পান করাতে হবে। এতে শরীরে পানির ঘাটতি দূর হয় এবং দুটি রোগ নিরাময় ঘটে। যেসব রোগী মুখে খাবার গ্রহণ করতে পারে না তাদেরকে শিরার মধ্যে স্যালাইন দিতে হয়। তাছাড়া সংক্রমণ রোধ বা নিরাময়ের জন্য টেট্রাসাইলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। বমি বন্ধের জন্য প্রোমেথাজিন থিয়োক্রেটে জাতীয় ঔষধ দেওয়া যেতে পারে। এসব ঔষধ বা ব্যবস্থাগুলো অবশ্যই অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমেই নিতে হবে। রোগীর অবস্থা বেশি খারাপ হলে দুটি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

৩. সোহানের কলেরা রোগের জন্য দায়ী অণুজীব হলো *Vibrio cholerae* নামক গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া। তাই সোহানের রোগের জন্য দায়ী জীবাণুর ন্যায় অণুজীব বলতে এখানে ব্যাকটেরিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

মানুষের অধিকাংশ মারাঞ্চক রোগ যেমন- যক্ষা, নিউমেনিয়া, টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি রোগ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে হয়ে থাকে। কিছু ব্যাকটেরিয়া খাদ্য দ্রব্য পচিয়ে বিষাক্ত করে তোলে। পানি দূষণ ও মাটির উর্বরতা বিনষ্টকরণও কিছু ব্যাকটেরিয়ার কারণে ঘটে থাকে। শুধু তাই নয় গমের টুকু রোগ, ধানের পাতা ধূসা, লেবুর ক্যাংকার, আলুর স্ক্যাব ইত্যাদি রোগসহ বিভিন্ন প্রাণীর মারাঞ্চক রোগও এই ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ঘটে থাকে, যা আমাদের আর্থিক ক্ষতি ঘটায়। তবে ক্ষতির পাশাপাশি ব্যাকটেরিয়ার উপকারী দিকও কম নয়। ব্যাকটেরিয়া থেকে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকসহ কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষা প্রভৃতি মারাঞ্চক রোগের প্রতিষেধক টিকাও তৈরি করা হয়। কিছু ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এছাড়াও চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাট থেকে আঁশ এবং চামড়া থেকে লোম ছাড়ানোয় ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোৰা যায় উক্ত অণুজীব অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া আমাদের শুধু ক্ষতি করেই না, উপকারও করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ শিক্ষক ছাত্রদের বললেন, কিছু অণুজীব আছে যেগুলো ভাইরাসের চেয়ে একটু বড় এবং সব জায়গায় পাওয়া যায়। তিনি আরও বললেন, এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাবের পাশাপাশি পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে।

/বিট্রিসাস ক্যারেট কলেজ/

- ক. ইমার্জিং ভাইরাস কাকে বলে? ১
- খ. ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অণুজীবের শ্রেণিবিভাগ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শেষ লাইনটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ভাইরাস আদি পোষক থেকে নতুন পোষক প্রজাতিতে রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে ইমার্জিং ভাইরাস বলে।

খ ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য হলো—

- ব্যাকটেরিয়ায় আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে। অপরদিকে ভাইরাসে নিউক্লিয়াস থাকে না।
- ব্যাকটেরিয়া সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু ভাইরাস তা পারে না।
- ব্যাকটেরিয়ায় বিপাক ক্রিয়া ঘটে। কিন্তু ভাইরাসে বিপাক ক্রিয়া ঘটে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। আকৃতি অনুসারে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ নিচে দেওয়া হলো —

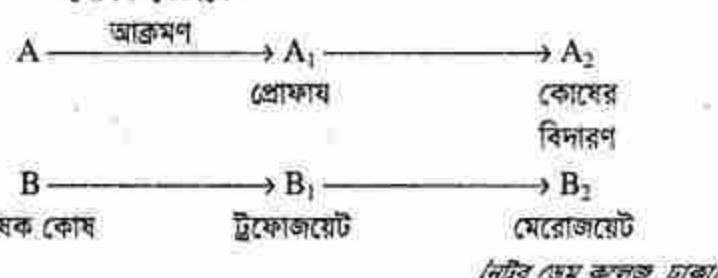


ঘ উদ্দীপকের শেষ লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে "ব্যাকটেরিয়ার ক্ষতিকর প্রভাবের পাশাপাশি পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে।" বিভিন্ন ধরনের প্রাণরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ব্যাকটেরিয়া থেকে পেয়ে থাকি। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধকও ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাকটেরিয়া বায়ুস্থ নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। দুধ থেকে পনির, দই, মাখন, ছানা ইত্যাদি তৈরিতেও ভূমিকা রাখে ব্যাকটেরিয়া। পাট থেকে আঁশ ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। চা, কফি ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত এনজাইমের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া ব্যাকটেরিয়া অনেক সময় আমাদের ক্ষতি ও করে থাক। যেমন- মানুষের যক্ষা, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণেই হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়ায় আক্রমণে অনেক সময় ফসলি উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে। কিন্তু ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া মাটির উর্বরতা নষ্ট করে। ব্যাকটেরিয়ার কারণে অনেক সময় খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পানি দূষণের প্রধান কারণ হয়ে দাঢ়ায় ব্যাকটেরিয়া।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যাকটেরিয়ার কিছু ক্ষতিকর প্রভাব থাকলেও এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক।

প্রশ্ন ▶ ২৩ A এবং B দুটি ভিন্ন ধরনের পরজীবী, যারা পোষক কোষের ক্ষতি সাধন করে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

পোষক কোষকে



- ক. ক্যাপসিউল কি? ১
- খ. প্রমাণ কর "ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন একটি রিকমিনেশন প্রক্রিয়া।" ২
- গ. A₁ এবং A₂ পর্যায়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে A পরজীবীর জীবনচক্র আলোচনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের B পরজীবীর B₁ হতে B₂ সৃষ্টির কৌশল উল্লেখপূর্বক রোগের লক্ষণ ও জীবের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পলিপেপটাইড বা পলিস্যাকারাইড স্বারা গঠিত ব্যাকটেরিয়াম কোষের সর্ববাহিরের স্তরেই হলো ক্যাপসিউল।

খ ব্যাকটেরিয়ার যৌন জননে দুটি ব্যাকটেরিয়া কোষ পাশাপাশি অবস্থান করে। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কোষের মিলিত প্রাচীরের একস্থানে কোষপ্রাচীর বিগলিত হয়ে যে সংযোগ নালী সৃষ্টি হয় তার ভেতর দিয়ে দাতাকোষের ক্রোমোসোম প্রাহীতা কোষে প্রবেশ করে। তবে ক্রোমোসোমের অংশিক প্রবেশ করার পরই ব্যাকটেরিয়া দুটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে ব্যাকটেরিয়ার যৌন জননে প্রাহীতা

কোষ ও দাতাকোষের আংশিক ক্রোমোসোম নিয়ে মেরোজাইগোট গঠিত হয়, যা ছি-বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়। সুতরাং ব্যাকটেরিয়ার এই যৌন জনন প্রক্রিয়ায় কোনো সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না, বরং দাতাকোষ আংশিক ক্রোমোসোম থারিয়ে অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে প্রথমে সংখ্যাবৃদ্ধির পরিবর্তে সংখ্যা হ্রাস পায়। কাজেই ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন একটি রিকমিনেশন প্রক্রিয়া।

গ উদ্বীপকে নির্দেশিত 'A' জীবাণুটি হলো T₁ ফায় ভাইরাস। T₁ ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে (পোষক কোষ) ফায় লাইটিক চক্রের মাধ্যমে ধ্বংস করে।

উদ্বীপকে A₁ এবং A₂ পর্যায় দ্বারা মূলত লাইটিক চক্রকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কাজেই T₁ ফায় ভাইরাসের জীবনচক্র লাইটিক চক্রের আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হলো—

প্রোকার্য/সংক্রমণ পর্যায়: ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তত্ত্বের সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের পায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষপ্রাচীর ছিন্ন হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যায়: ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

কোষের বিদারণ/বিগলন পর্যায়: ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিন্ন হয়ে নতুন ভাইরাসগুলো বের হয়ে আসে। এভাবে লাইটিক চক্রের মাধ্যমে T₁ ফায় ভাইরাসের জীবনচক্র সম্পন্ন হয়।

ঘ উদ্বীপকের 'B' পরজীবীটি হলো ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু। আর B₁ ও B₂ হলো ট্রফোজয়েট ও মেরোজয়েট দশা।

ম্যালেরিয়া পরজীবীর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বা লোহিত কণিকায় সংঘটিত সাইজোগনিতে নিম্নোক্তভাবে ট্রফোজয়েট হতে মেরোজয়েট সৃষ্টি হয়— হেপাটিক সাইজোগনি সম্পন্নের পর সৃষ্টি মেরোজয়েটগুলো লোহিত রক্তকণিকার ভেতরে খাদ্যগ্রহণ করে স্ফীত ও গোল হয়ে ট্রফোজয়েট (*trophozoite*)-এ পরিণত হয়। ট্রফোজয়েটের অভ্যন্তরে একটি গহ্নন সৃষ্টি হয়ে ক্রমশ তা বড় হয়ে সাইটোপ্লাজমাকে পরিধির দিকে সরিয়ে দেয়, নিউক্লিয়াসও এক পাশে অবস্থান নেয়।

আট ঘন্টার মধ্যে পরজীবীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃস্থ গহ্নন অনুশৃঙ্খলা হয়ে যায়, ফলে পরজীবীকে অনিয়ত ও ক্ষণপদযুক্ত অ্যামিবার মতো দেখায়। পরজীবীর এ দশাকে অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েট বলে। এ সময় লোহিত কণিকাটি আকারে বড় হয় এবং এর সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়। অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েট-এর ক্ষণপদ ক্ষমতা বিলীন হয়ে যায় এবং পরজীবীটি গোলাকার ধারণ করে। অতঃপর এর নিউক্লিয়াস অংশে পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে ১২-২৪টি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এ রকম বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত পরজীবীকে সাইজেট বলে। পরিণত সাইজেটে বহুবিভাজন ঘটে ১২-১৮টি গোল বা ডিস্কার সৃষ্টি হয়।

রোগের কারণ: *Plasmodium* শংগের প্রায় ৬০টি প্রজাতি মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীতে ম্যালেরিয়া নামক রোগটি সৃষ্টি করে।

লক্ষণ: ম্যালেরিয়া জুর-এর লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

- (i) প্রাথমিক পর্যায়ে মাথাধূরা, বর্মি বর্মি ভাব, অনিষ্টা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।
- (ii) দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগীর শীত অনুভূত হয় এবং কাঁপুনি দিয়ে জুর আসে। জুর ১০৫°-১০৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। কয়েক ঘন্টা পর জুর কমে যায়। ৪৮ ঘন্টা পর পর কাঁপুনি দিয়ে জুর আসাই *P. vivax* জীবাণু দ্বারা সৃষ্টি ম্যালেরিয়ার প্রধান লক্ষণ।
- (iii) তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর দেহে জীবাণুর সংখ্যা অসম্ভবভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে দুর্বল রক্তের লোহিত কণিকা ভাঙতে থাকে, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। প্রীতা ও মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটাতে পারে।

ঘ **১৪** সজির তার প্রবাসি বন্ধু লিমনকে ই-মেইলে লিখে জানিয়েছে, "২০১৭ সাল, ঢাকা শহরে সবচেয়ে আলোচিত শব্দ ব্যাথ-চরম ব্যাথ। প্রায় প্রতি ঘরেই কেউ না কেই এ ব্যাথ রোগে আক্রান্ত। গিটে ব্যাথ, বসলে উঠতে পারে না, উঠলে থাটতে পারে না, ব্যথার পাশাপাশি জুরও অনেক। পেপার, পত্রিকা ও টিভি-তে একই আলোচনা, পরামর্শ ও সর্তর্কতা। বিশেষজ্ঞের বার বার বলছে এ ধরনের রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধী উত্তম।"

বিষয়স্তে দুর মোহনস গাবলিক স্কুল এত কলেজ, ঢাকা/

- | | |
|--|---|
| ক. সাইজেট কী? | ১ |
| খ. ম্যালেরিয়া রোগে রঞ্জ শূন্যতা সৃষ্টি হয় কেন? | ২ |
| গ. উদ্বীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট জীবাণুর বৈশিষ্ট্য লেখ। | ৩ |
| ঘ. বিশেষজ্ঞের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বহু নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট ম্যালেরিয়া পরজীবীর দশাই হলো সাইজেট।

খ ম্যালেরিয়া হলো *Anopheles* মশকীবাহিত একধরনের মারাঘুক ঝররোগ। মানুষসহ বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণী এ রোগে আক্রান্ত হয়। মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় ম্যালেরিয়া এ পরজীবী বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় তার এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনি সম্পন্ন করে এবং লোহিত রক্তকণিকাকে ধ্বংস করে। এ রোগে লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হয় বলে রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়।

গ উদ্বীপকে 'চিকুনগুনিয়া' রোগকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা একটি মশাবাহিত ভাইরাসজনিত রোগ। ভাইরাসের বৈশিষ্ট্যগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: জড়-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবীয় বৈশিষ্ট্য। জড়-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

- ভাইরাস অকোষীয়, অতি আণীবীকণিক ও সাইটোপ্লাজমবিহীন রাসায়নিক পদাৰ্থ।
- পোষক দেহের বাইরে কোনো জৈবনিক কার্যকলাপ ঘটায় না।
- জীবকোষের বাইরে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না।
- পরিস্থিত ও ক্লেসিত করে ভাইরাসকে স্ফটিকে পরিণত করা যায়।
- ভাইরাস আকারে বৃদ্ধি পায় না এবং পরিবেশিক উদ্বীপনায় সাড়া দেয় না।
- এদের নিজস্ব কোন বিপাকীয় এনজাইম নেই।
- ভাইরাস রাসায়নিকভাবে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডের সমাহার মাত্র।

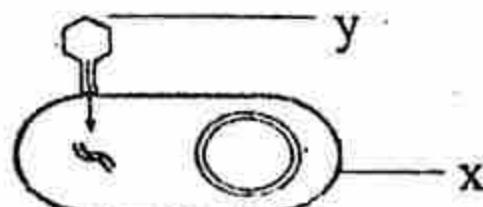
জীবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

- গাঠনিকভাবে ভাইরাসে নিউক্লিক এসিড (DNA বা RNA) আছে।
- উপযুক্ত পোষক কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সক্ষম।
- ভাইরাস সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবী।
- জিনগত পুনর্বিন্যাস ঘটতে দেখা যায়।
- ভাইরাসে প্রকরণ ও পরিবাস্তি দেখা যায়।

ঘ উদ্বীপকে চিকুনগুনিয়া রোগকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ রোগটি এডিস মশার সংক্রমণে হয়ে থাকে। তাই মশার কামড় থেকে সুরক্ষাই এ রোগ থেকে বাঁচার প্রধান উপায়। আর ব্যক্তি সচেতনায় এ রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। তাই এ রোগ প্রতিরোধের জন্য মশা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বৃমানের আগে মশার টাঙ্গাতে হবে, সন্তুষ্ট হলে লম্বা হাতাযুক্ত জামা ও ট্রাউজার পরিধান করতে হবে, জানালায় নেট ব্যবহার করতে হবে, শরীরে মশা প্রতিরোধক ক্রিম ব্যবহার করতে হবে। এডিস মশা স্থির পানিতে ডিম পাড়ে। তাই বালতি, ফুলের টব, গাঢ়ির টায়ার প্রভৃতি স্থানে যেন পানি জমতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এসব প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। তারপরও কোন ব্যক্তি যদি এ রোগে সংক্রমিত হয় তবে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও তরল জাতীয় খাবার খেতে দিতে হবে। অস্থিসম্বিন্দির ব্যথার জন্য ঠাড়া পানির সেক দিতে হবে এবং হালকা

ব্যায়াম করতে হবে এবং অবশ্যই ভাস্তুরের প্রামাণ অনুযায়ী উৎস সেবন করতে হবে। তবে এই রোগের কার্যকরী অনুমোদিত কোনো টিকা নেই। সাধারণত বাহিক এডিস মশা এইরোগে আক্রান্ত বাস্তিকে কামড়ানোর পর অন্য কাউকে কামড়ালে এই বাস্তিক এ রোগে আক্রান্ত হবে। আর একারনেই প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ পারে এই রোগ থেকে কোনো বাস্তিকে সুরক্ষা দিতে। সুতরাং বিশেষজ্ঞদের "এ ধরনের রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উভয়"- এই মন্তব্যটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ২৫



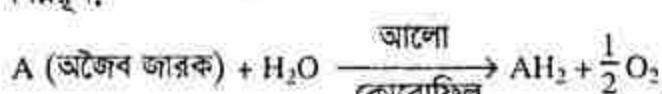
ব্যাক্টেরিয়ান স্কুল এচ কলেজ, ঢাকা।

- ক. প্রৱেদন কাকে বলে? ১
- খ. হিল বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্বীপকের চিত্রিতে যে প্রক্রিয়াটি দেখানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. কৃষি, শিল্প, পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় X এর ভূমিকা বিশেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে শারীরত্বাদ্বিক প্রক্রিয়ায় উত্তিদের বায়বীয় অঙ্গ হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাস্পকারে বের হয়ে যায় তাকে প্রৱেদন বলে।

খ. ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ রবিন হিল, যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে CO_2 -এর অনুপস্থিতিতে ক্লোরোফিল, পানি ও কিছু অজৈব জারক একত্রে আলোতে রেখে প্রমাণ করেন, সালোকসংশ্লেষণে নির্গত O_2 -এর উৎস হলো পানি, সেই বিক্রিয়াটিই হলো হিল বিক্রিয়া। হিল বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



বিজ্ঞানী রবিন হিল-এর নামানুসারে এ বিক্রিয়াটির নামকরণ করা হয় হিল বিক্রিয়া।

গ. উদ্বীপকের চিত্রিতে ব্যাকটেরিওফায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় দেখানো হয়েছে। নিচে ব্যাকটেরিওফায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা হলো—

সংক্ষিপ্ত পর্যায়: ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। সম্পর্ক তত্ত্ব সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনিটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনিটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তর্ফেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়: ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

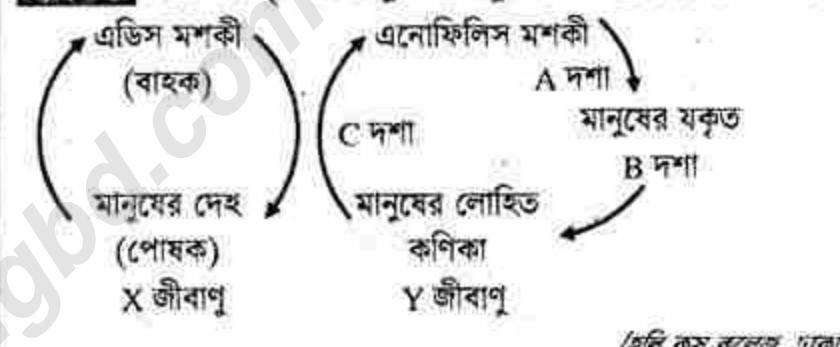
নতুন ভাইরাস মুক্তি বা বিগলন পর্যায়: পোষক কোষের অভ্যন্তরে প্রচুর সংখ্যাক ব্যাকটেরিওফায় তৈরি হওয়ার পর ফায় একটি সুনিশ্চিত এনজাইম তৈরি করে যার কার্যকারিতায় পোষক কোষের প্রাচীর বিনিপত্তি হয়ে যায় এবং নতুন সৃষ্টি ব্যাকটেরিওফায়গুলো মুক্তভাবে বেরিয়ে আসে।

ঘ. উদ্বীপকে উল্লিখিত X হলো ব্যাকটেরিয়া। কৃষি, শিল্প, পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা নিচে বিশেষণ করা হলো—
কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া মাটির জৈব পদার্থ সঞ্চয় করে উর্বরতা বৃদ্ধি করে। নানাবিধি আবর্জনা পচানোর মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জৈব সার প্রস্তুত করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া মাটিতে নাইট্রোজেন স্থাপন করে আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উত্তিদের মূলের নভিউলে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া জমিতে কতিকর পতল নিয়ন্ত্রণে আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া ফসলের ফলন বৃদ্ধিতেও ব্যবহৃত হয়।

শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার ব্যাপক। চা, কফি, তামাক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণে, দুর্ঘজাত শিরে, পাট শিরে, চামড়া তৈরি, ল্যাকটিক আসিড তৈরি, আয়সিটোন তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

মানুষের অন্তর্বে *E. coli* ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন-বি, ভিটামিন-কে, ভিটামিন-বি_১, কোলিক আসিড, বায়োটিন প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে। জিন প্রকৌশলেও ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও আবর্জনা পচনে, পয়ঃনিষ্কাশনে, পানিতে ভাসমান তেল অপসারণেও ব্যাকটেরিয়ার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ২৬ নিচে জরুর সৃষ্টিকারী দুটি জীবাণুর জীবন চক্র দেখানো হল।



- ক. ক্যাপসোমিয়ার কী?

১ খ. লাইটিক চক্র ঘটায় এমন একটি জীবাণুর চিহ্নিত চক্র আঁক। ২

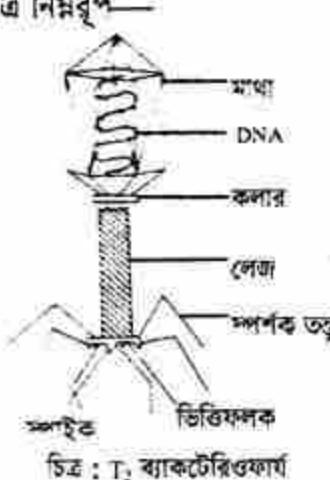
গ. X জীবাণুর নিউক্লিক এসিডে বিদ্যমান কার্বোহাইড্রেটের গাঠনিক সংকেত আঁক। ৩

ঘ. Y জীবাণুর ক্ষেত্রে A হতে B দশা এবং C দশা হতে A দশা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কী ধরনের পার্থক্য দেখা যায় উল্লেখ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

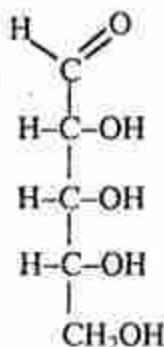
ক. ভাইরাস ক্যাপসিডের প্রতিটি প্রোটিন অণুই হলো ক্যাপসোমিয়ার।

খ. T₁ ব্যাকটেরিওফায় লাইটিক চক্র ঘটায়। T₁-ব্যাকটেরিওফায় জীবাণুটির চিহ্নিত চক্র নিম্নরূপ—



ঘ. উক্তিপ্রক্রে 'X' জীবাণুটি হলো ডেজু ভাইরাস। এটি একটি RNA ভাইরাস। RNA ভাইরাসটির নিউক্লিক এসিডে বিদ্যমান কার্বোহাইড্রেট

হলো রাইবোজ। রাইবোজের আণবিক সংকেত $C_5H_{10}O_5$ । রাইবোজের গাঠনিক সংকেত নিম্নরূপ—



চিত্র : রাইবোজের গাঠনিক সংকেত

ম উদ্দীপকের **Y** জীবাণুটি হলো ম্যালেরিয়ার পরজীবী *Plasmodium*। জীবাণুটির ক্ষেত্রে A হতে B দশা দ্বারা হেপাটিক সাইজোগনি এবং C হতে A দশা দ্বারা স্পেরোগনিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এদের মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়—

হেপাটিক সাইজোগনি	স্পেরোগনি
i. হেপাটিক সাইজোগনি মানুষের যকৃতে সংঘটিত হয়।	i. স্পেরোগনি মশাকের দেহে সংঘটিত হয়।
ii. এ পর্যায়ে মেরোজাইগোট তৈরি হয়।	ii. এ পর্যায়ে জাইগোট তৈরি হয়।
iii. এ পর্যায়ে মেটাক্রিটোমেরোজয়েট, ম্যাক্রো-মেটাক্রিটোমেরোজয়েট এবং ক্রিটোজয়েট সৃষ্টি হয়।	iii. এ পর্যায়ে স্পেরোজয়েট ও উওসিস্ট সৃষ্টি হয়।
iv. এ পর্যায়ে প্রতিটি ক্রিটোজয়েটের নিউক্লিয়াস ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যে বহু নিউক্লিয়াস দশায় পরিণত হয়।	iv. এ পর্যায়ে ক্রপের গায়ে সংলগ্ন প্রতিটি উওসিস্টের নিউক্লিয়াস প্রথমে মায়োসিস ও পরে বারবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে বহু সংখ্যক হ্যাপ্লয়োড নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।
v. পরিণত ক্রিটোমেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষে প্রবেশ করে নিউক্লিয়াসের বার বার বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট সাইজটি দশায় পরিণত হয়।	v. উওসিস্ট প্রাচীরে আবস্থ থাকা অবস্থায় জীবাণুর প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ধীরে প্রথমে সাইটোপ্লাজমে জমা হয় এবং পরে তার চারদিকে কোষ পর্দা দ্বারা গঠিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষে পরিণত হয়।
vi. এ দশা সম্পন্ন হতে ২-৩ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়।	vi. এ দশা সম্পন্ন হতে ১০-১২ দিন প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭

X = নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন নির্মিত জড় পদার্থের ন্যায় অণুজীব।
Y = গবাদি পশুর অন্তে বাস করে, সেলুলোজ হজমে সাহায্য করে।

(আইডিয়াল স্কুল এড কলেজ, মাতিবিল, ঢাকা)

- ক. ফিমতি কী? ১
খ. ম্যালেরিয়া পরজীবীদের নাম ও সুপ্তকাল লিখ। ২
গ. উদ্দীপক 'X' এর বাজাচি আকৃতির গঠনটি লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপক 'Y' এর উপর 'X' এর বংশবৃদ্ধি নির্ভরশীল তা ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পিলিন নামক প্রোটিন নির্মিত ব্যাকটেরিয়ার বহিগাত্রের খাটো সূত্রাকার উপাঞ্চাই হলো ফিমতি।

খ. ম্যালেরিয়া পরজীবীদের নাম ও সুপ্তকাল :

ম্যালেরিয়া পরজীবী	সুপ্তকাল
i. <i>Plasmodium vivax</i>	১২-২০ দিন
ii. <i>Plasmodium falciparum</i>	৮-১৫ দিন
iii. <i>Plasmodium malariae</i>	১৮-৪০ দিন
iv. <i>Plasmodium ovale</i>	১১-১৬ দিন

গ উদ্দীপকের 'X' হলো ভাইরাস এবং ব্যাঙাচি আকৃতির ভাইরাসকে বলা হয় T₂-ব্যাকটেরিওফায়।

T₂-ফায় ভাইরাসের দেহকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়, যথা : মাথা ও লেজ।

T₂-ফায় ভাইরাসের মাথাটি স্ফীত ও ষড়ভূজাকৃতির। এটি প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরি। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৩-১০০ nm এবং প্রস্থ ৬৫ nm। থলির মতো এ স্ফীত অংশের ভেতরে রিং আকৃতির ছি-সূত্রক একটি DNA অণু প্যাচানো অবস্থায় থাকে। এই DNA তে ৬০,০০০ জোড়া নিউক্লিওটাইড থাকে। এতে জিন থাকে প্রায় ১৫০টি।

T₂-ফায়ের লেজের প্রধান অংশটি একটি ফাঁপা নলের মতো। লেজটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৫-১১০ nm এবং ব্যাস প্রায় ১৫-২৫ nm। লেজের উপরিভাগে সুস্পষ্ট চাকতির মতো একটি কলার আছে। লেজের অভ্যন্তরে কোনো DNA নেই। নিচের দিকে একটি বেসপ্লেট, কাটা মতো ৬টি স্পাইক ও ৬টি স্পর্শক তন্তু আছে। লেজ, কলার, বেসপ্লেট, স্পাইক এবং স্পর্শক তন্তু সবই প্রোটিন দ্বারা গঠিত।

T₂-ব্যাকটেরিওফায় ভাইরাসের দেহে কোনো নিউক্লিয়াস, কোষ প্রাচীর, অন্য কোনো ক্ষুদ্রজগ্নি নেই।

ঘ উদ্দীপকের X-দ্বারা T₂ ব্যাকটেরিওফায় এবং Y-দ্বারা *E.coli* ব্যাকটেরিয়ামকে বোঝানো হয়েছে। T₂-ব্যাকটেরিওফায় এর বংশবৃদ্ধি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এরা Y অর্থাৎ *E.coli* এর উপর নির্ভরশীল।

T₂-ব্যাকটেরিওফায় তাদের বংশবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথমে *E.coli* ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীরে সঙ্গে সংযুক্ত হয়। পরে এনজাইমের কার্যকারিতায় ব্যাকটেরিয়ার প্রাচীরে ছিদ্র তৈরির মাধ্যমে ফায় DNA ব্যাকটেরিয়াম কোষে প্রবেশ করায়। ব্যাকটেরিয়াম কোষের অভ্যন্তরে অসংখ্য ফায় DNA এবং ফায় কোট প্রোটিন তৈরি হয়। ফায় কোট প্রোটিন পরবর্তীতে নতুন ফায়ের মাথা, লেজ, স্পর্শকতন্তু ও স্পাইক তৈরি করে।

এপর অপর্যায় ফায় DNA এবং অন্যান্য প্রোটিন অংশগুলো যুক্ত হয়ে অসংখ্য নতুন T₂ ফায় তৈরি হয়। সবশেষে *E.coli* কোষপ্রাচীর বিগলনের মাধ্যমে অপর্যায় T₂ ব্যাকটেরিওফায়গুলো বাইরে বের হয়ে আসে। এভাবে X তথা T₂ ফায় তাৰ বংশবৃদ্ধি কৰে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, X-এর বংশবৃদ্ধি *E.coli* ব্যাকটেরিয়ামের অভ্যন্তরেই ঘটে থাকে এবং Y এর অনুপস্থিতিতে X-এর বংশবৃদ্ধি সম্ভব নয়।

সুতরাং, সবশেষে বলা যায় Y-এর উপর X-এর বংশবৃদ্ধি নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ▶ ২৮ ম্যালেরিয়া একটি জীবাণুবাহিত রোগ। মশার কামড়ে এটি এক মানুষ হতে অন্য মানুষে বিস্তার লাভ করে।

(শেখ বেগবন্দুকীন পোষ্ট একাডেমী কলেজ, ঢাকা)

- ক. ধানের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। ১
খ. সাইজোগনি কী? ২
গ. উদ্দীপকের ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্রের যে অংশ মানুষের যকৃত কোষে ঘটে তা লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রোগটির প্রতিকার লিখ। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধানের বৈজ্ঞানিক নাম *Oryza sativa*।

খ মানবদেহের যকৃত এবং লোহিত কণিকায় সংঘটিত ম্যালেরিয়া জীবাণু *Plasmodium* এর অয়েন চক্র কে বলে সাইজোগনি।

মানবদেহে ম্যালেরিয়া পরজীবী অয়েন জনন সম্পন্ন হয় যা মূলত দুটি পর্যায়ে বিভক্ত— একটি হেপাটিক সাইজোগনি যা মানবদেহের যকৃতে এবং অন্যটি এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি যা লোহিত রক্ত কণিকায় সংঘটিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের ম্যালেরিয়ার জীবাণু অর্থাৎ *Plasmodium* মানুষের যকৃতে হেপাটিক সাইজোগনি সম্পন্ন করে। হেপাটিক সাইজোগনিটি প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি ও এরো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি এ দু'ভাগে বিভক্ত।

মশকীর লালারসে এ পরজীবীর স্পেরোজয়েট দশা থাকে যা দৎশনের মাধ্যমে মানুষের রক্তে প্রবেশ করে। মানবদেহে স্পেরোজয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সপ্তাহে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বৃদ্ধি করে। স্পেরোজয়েটগুলো রক্তরস থেকে যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাণী হয়। যকৃত কোষ থেকে খাদ্য প্রহণ করে স্পেরোজয়েটগুলো গোলাকার ক্রিটেজয়েটে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্রিটেজয়েট ক্রমাগত নিউক্লিয়াস বিভাজনের মাধ্যমে বহুনিউক্লিয়াসমূল্য সাইজন্ট দশায় উপনিত হয়। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় যা ক্রিটেমেরোজয়েট নামে পরিচিত। পরিণত ক্রিটেমেরোজয়েটগুলো সাইজন্টের প্রাচীর বিদীর্ণ করে যকৃতের সাইনুসয়েডে আশ্রয় নেয়।

এভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবী যকৃতে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনি সম্পন্নের পর উৎপন্ন মেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনির সূচনা করে যা পরবর্তীতে সাইজন্ট দশায় পৌছায়। সাইজন্ট দশা থেকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই বিভক্ত নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হওয়ার মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় যাদেরকে মেটাক্রিটেমেরোজয়েট বলে। এগুলো আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ণ করে বের হয়ে আসে।

এভাবেই ম্যালেরিয়া জীবাণু মানুষের যকৃতে হেপাটিক সাইজেগনি সম্পন্ন করে।

ব উদ্বীপকের রোগটি হলো ম্যালেরিয়া। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিকার করা যায়। ম্যালেরিয়া প্রতিকারের প্রধান তিনটি উপায় হচ্ছে— ক. মশকী নিধন, খ. মশকীর দৎশনের হাত থেকে আঘাতকা এবং গ. ম্যালেরিয়াগ্রান্ত রোগীর চিকিৎসা। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো—

ক. মশকী নিধন: মশককুলের বৎশ ধ্বংস করা কঠিন কাজ। তবে নিম্নলিখিত পদ্ধতায় এদের বিস্তার রোধ করা সম্ভব।

i. **জননক্ষেত্র নির্মূলকরণ:** মশকী বন্ধ, পচা পানিতে ডিম পাড়ে এবং সেখানে ডিম ফুটে লার্ভা ও পিউপা দশার বিকাশ ঘটে। তাই মশকী নিধনের জন্য জননক্ষেত্রগুলো বিনাশ করাই উত্তম। নিম্নোক্ত উপায়ে এ কাজ করা যায়। ডোবা, নালা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গর্ত মাটি দিয়ে ভরাট করা উচিত যাতে ঐসব স্থানে পানি জমতে না পারে। উন্মুক্ত নদীমাগুলো দেকে রাখার ব্যবস্থা করা এবং নদীমাগুলো যাতে পানি বন্ধ না থাকে সে দিকে নজর দেওয়া। বাড়ির আশেপাশে ঝোপ-ঝোড় ও জঙ্গল কেটে ফেলা। লোকালয়ের আশেপাশে যাতে পানি আবন্ধ হয়ে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

ii. **লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস সাধন:** যেসব জলাশয়ে মশকী ডিম পাড়ে সেখানে পানির উপর কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় তেল ছিটিয়ে দিলে পানির উপর একটি পাতলা স্তর সৃষ্টি হয়। ফলে এ স্তর তেল করে মশকীর লার্ভাগুলোর পক্ষে বাতাস গ্রহণ করা সম্ভবপ্রভু না হওয়ায় তারা মারা পড়ে। বিএইচসি, ডায়েলিন্ড্রিন ইত্যাদি কীটনাশক ওষুধ তেলের পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর লার্ভা ও পিউপা মারা যায়।

iii. **পূর্ণাঙ্গ মশকী নিধন:** দৎশন উদ্বৃত মশকী হাত দিয়ে মেরে ফেলা যায়। বিভিন্ন ফাঁদের সাহায্যে মশকী ধরা সম্ভব। সালফার ডাই-অক্সাইডের ধোয়া মশকী তাড়াতে বা মেরে ফেলতে সাহায্য করে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও বিকিরণ দিয়ে বন্ধ্যাত্ত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে এদের বৎশবিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ. মশকীর দৎশনের হাত থেকে আঘাতকা: শয়নকক্ষে মশকী ব্যবহার করতে হবে। দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ক্রিম বা লোশন লাগাতে হবে। মশকী নিধন কয়েল জ্বালাতে হবে। ঘরের দরজা জানালায় ঘন তারের নেট লাগাতে হবে।

গ. ম্যালেরিয়াগ্রান্ত রোগীর চিকিৎসা: ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত রোগীকে সর্বদা মশকীর মধ্যে রাখতে হবে। রোগীকে যেন কোনভাবেই মশকী দৎশন করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা মশকীর মাধ্যমে রোগীর দেহ থেকে এই রোগের পরজীবী অন্য সৃষ্টি ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হলে তৎক্ষণাত্মে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্রোরোকুইন, নিভাকুইন, ম্যাপাক্রিন, প্যালুড্রিন ইত্যাদি ম্যালেরিয়া পরজীবী ধ্বংসের ভাল ওষুধ।

গ্ৰন্থ ► ২৯ উদ্বিধ বিজ্ঞান ক্লাসে জাহিদ সার পাঠদানের সময় বললেন, কিছু অকোষীয় অণুজীব আছে যা নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত। এরা ব্যাটেরিয়াকে আক্রমণ করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং ব্যাটেরিয়াকে ধ্বংস করে ফেলে। /সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢেক্কা/

ক. প্লাইকোক্লিয়ালিঞ্চ কী?

খ. মায়োসিসকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয় কেন?

গ. উদ্বীপকে উল্লেখিত অণুজীবের আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস কর।

ঘ. উদ্বীপকের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়াটি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্লাইকোপ্রোটিন ও প্লাইকোলিপিড এর সম্পর্ক বৃপ্তই প্লাইকোক্লিয়ালিঞ্চ।

খ. মায়োসিস কোথা বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি প্রকৃতকোষ বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভক্ত হয়ে চারটি অপ্ত্য কোষে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়ায় কোষের নিউক্লিয়াস দু বার এবং ক্রোমোসোম একবার বিভাজিত হয়। ফলে অপ্ত্য কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা মাত্রকোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অর্ধেক হয়ে যায়। ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পায় বলে এ বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয়।

গ. উদ্বীপকে উল্লেখিত অণুজীবটি হলো ভাইরাস। ভাইরাসের আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ—

i. **দণ্ডকার :** এদের আকার অনেকটা দণ্ডের মতো। উদাহরণ— টোবাকো মোজাইক ভাইরাস (TMV), আলফা-আলফা মোজাইক ভাইরাস, মাস্পস ভাইরাস।

ii. **গোলাকার :** এদের আকার অনেকটা গোলাকার, বর্তুলাকার ও বহুভুজাকার। উদাহরণ— পোলিও ভাইরাস, TIV, HIV, ডেজু ভাইরাস।

iii. **ঘনক্ষেত্রাকার :** এসব ভাইরাস দেখতে অনেকটা পাউরুটির মতো। যেমন— হার্পিস, ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস।

iv. **ব্যাঙাচি আকার :** এরা মাথা ও রেজ— এ দুই অংশে বিভক্ত। উদাহরণ— T₂, T₄, T₆ ইত্যাদি।

v. **সিলিঙ্ক্রিয়াল :** এদের আকার লম্বা সিলিঙ্কারের মতো। যেমন— Ebola virus।

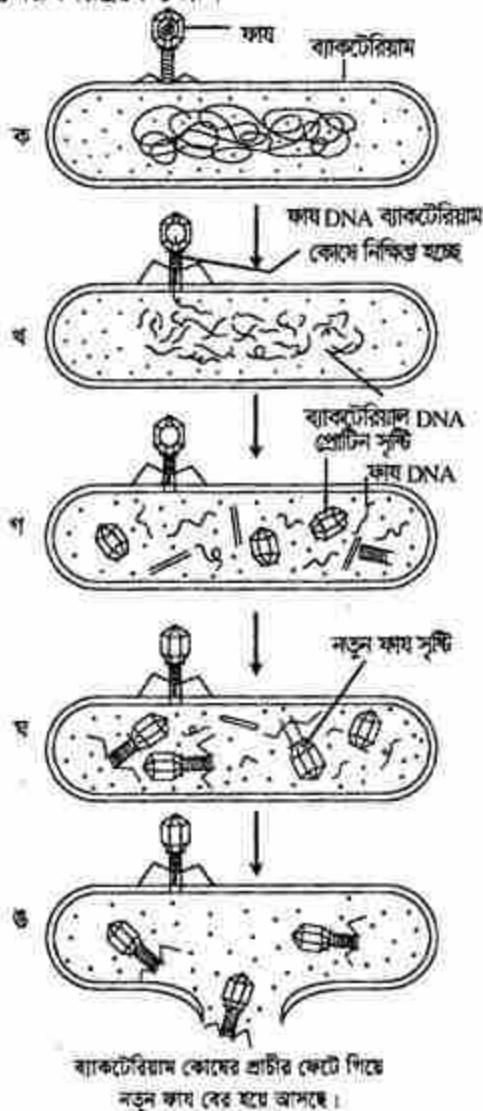
vi. **ডিঘাকার :** এরা অনেকটা ডিঘাকার। উদাহরণ— ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস।

ঘ. উদ্বীপকে উল্লেখিত অণুজীবটি হলো ভাইরাস। ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধির পদ্ধতিকে অনুলিপন বলে। T₂ ফায় ভাইরাসের ক্ষেত্রে সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। নিচে সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হলো—

পৃষ্ঠলগ্ন হওয়া: T₂ ফায় Escherichia coli ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের নির্দিষ্ট স্থানে স্পর্শকৃত এবং স্পাইকের সাহায্যে পৃষ্ঠলগ্ন হয়।

অনুপ্রবেশ: পৃষ্ঠলগ্ন হওয়ার পর স্পর্শক তন্ত্রের সাহায্যে ভাইরাস তার দেহটিকে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরের যথাস্থানে আবদ্ধ করে এবং লাইসোজাইম এনজাইমের কার্যকারিতায় ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে ছিঁড়ি সৃষ্টি করে। ফায় লেজের প্রোটিন আবরণকে বাইরে রেখে শুধুমাত্র DNA কে ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশ করায়।

সুপ্রকাল: অনুপ্রবেশের ১২-২২ মিনিট সময় পর্যন্ত ভাইরাসের DNA কে পোষক কোষে দেখা যায় না। এখানে ফায় DNA পোষক কোষের ক্রোমাটিন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পোষকের বংশগতীয় ক্রিয়াকলাপ নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়।



চিত্র: T, ফায়ের সংশ্যবৃত্তি প্রক্রিয়া

ফায়ের অঙ্গ উৎপাদন: কোষের কেন্দ্রাংশ বরাবর পলিমারেজ এনজাইমের সহায়তায় ব্যাকটেরিয়া কোষের নিউক্লিওটিইড ব্যবহার করে নতুন ফায় DNA-র অনুলিপি তৈরি হয়। নতুন ফায় DNA থেকে হে mRNA তৈরি হয় তা পোষক কোষের রাইবোজোমীয় ফ্যাক্টরিতে (ফায়ের জন্য) প্রোটিনের খোলস তৈরি করে থাকে।

নতুন T₄ ফায় সৃষ্টি: পোষক কোষের অভ্যন্তরে অপত্য DNA ও প্রোটিন খোলস তৈরির পর এক কপি DNA অণু প্রোটিন খোলসে প্রবেশ করে। শেষে লাইসোজাইম এর সংশ্লেষ ঘটে এবং নতুন কার্যকর T₄ ফায় তৈরি হয়।

বিগলন বা লাইসিস: লাইসোজাইম এনজাইমের অনুরূপ কোনো পদার্থ পোষক কোষ হতে সৃষ্টি হওয়ার কারণেই পোষক কোষ প্রাচীরের মিউকোপ্রোটিন কমপ্লেক্স জাতীয় যোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে কোষ প্রাচীর বিদীর্ণ হয় এবং অপত্য T₄ ফায় বাইরে নির্গত হয়।

প্রয়োজনীয় কৃষক জরুরী তার পেপে বাগানে গিয়ে লক্ষ্য করলো পেপেগুলোতে গাঢ় সবুজ বর্ণের গোলাকার দাগ পড়েছে। অপরদিকে ধানক্ষেতের অবস্থাও শোচনীয়। কারণ ধানের পাতা ও বেটায় লম্বা দাগের সৃষ্টি হয়েছে এবং দাগগুলো আস্তে আস্তে হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। জরুরী মিয়া কৃষি কর্মকর্তার শরণাপন হলে সে জানতে পারে পেপে গাছ ও ধান গাছ দুইটি ডিম অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত।

সরকারি বিজ্ঞান বিদেশ, ঢেক্সার্ট, ঢাকা।

- ক. বায়োম কী? ১
- খ. লাইকেন কে বিশ্বজনীন উত্তি বলা হয় কেন? ২
- গ. জরুরী মিয়ার ফসল রক্ষায় কী কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অণুজীব দুইটির তুলনামূলক চরিত্র নিরূপণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. একই ধরনের জলবায়ু, একই ধরনের মাটি, একই জাতীয় বৈশিষ্ট্যসম্পর্ক উত্তি ও প্রাণী নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমই হলো বায়োম।

ব. লাইকেন এক বিশেষ ধরনের উত্তি যা ছাতাক এবং এককোষী শৈৱাল বা সায়ানো-ব্যাকটেরিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহস্থানে সৃষ্টি। গাছের বাকল, পাতা, ক্ষয়প্রাপ্ত গুড়ি, দেয়াল, পাথর, পর্বতগাত্র ইত্যাদি বস্তুর উপর এরা জন্মায়। তুন্দা অঞ্চল, মরু অঞ্চল, নীরস পর্বতগাত্রসহ যেকোনো প্রতিকূল অবস্থানে লাইকেন জন্মায় বলে একে বিশ্বজনীন উত্তি বলা হয়।

গ. জরুরী মিয়ার পেপে বাগানে পেপে রিংস্পট বা মোজাইক রোগ দেখা দিয়েছে। এ রোগ থেকে ফসল রক্ষায়—
জমিতে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে সাথে সাথেই রোগক্রান্ত গাছ উঠিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। জাল দিয়ে পুরো জমি (পেপের গাছসহ) ঢেকে দিতে হবে যেন এফিড পতঙ্গ দ্বারা নতুন গাছ আক্রান্ত না হতে পারে। এফিড পতঙ্গ নিধনের জন্য পেস্টিসাইড স্প্রে করা যেতে পারে। চারা লাগানোর প্রথম থেকেই নিয়মিত পেস্টিসাইড স্প্রে করলে এফিড পতঙ্গ দ্বারা রোগ ছড়ায় না। রোগক্রান্ত জমিতে পেপে গাছের পুনি (পাতা কাটা, ছাঁটা ইত্যাদি) বন্ধ রাখতে হবে, কারণ কাটা-ছেড়া স্থান দিয়ে রোগক্রমণ ঘটে থাকে। জরুরী মিয়ার ধান ক্ষেতে ধানের লিফ ব্রাইট রোগ হয়েছে। এক্ষেত্রে ফসল রক্ষায়—
রোগ প্রতিরোধক জাত ব্যবহারে সাধ্যী ও নিশ্চিত রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। মালা, বিপ্লব, আশা, বি-২৯ জাত অপেক্ষাকৃত প্রতিরোধী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাতাকনাশকের সাথে স্ট্রেন্টোমাইসিন (250 ppm) মিশিয়ে স্প্রে করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বীজ বপনের আগে ০.১% সিরিসান দ্রবণে ৮ ষষ্ঠা ভিজিয়ে রাখলে বীজ বাহিত সংক্রমণ রোধ হয়। এছাড়া ব্রিচিং পাউডার (100 mg/ml) এবং জিঙ সালফেট (২%) দ্বারা বীজ শোধন করা যায়। পরিযোজ্য বড়, আগাছা, আবর্জনা সরিয়ে ফেলতে হবে। পরিমিত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করতে হবে।

ঘ. জরুরী মিয়ার পেপে বাগান আক্রমণকারী অণুজীব হলো ভাইরাস এবং ধানক্ষেতে আক্রমণকারী অণুজীব হলো ব্যাকটেরিয়া। উভয় অণুজীবই মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী এবং উত্তির রোগ ছড়ায়। আবার এদের নানারকম উপকারী ভূমিকাও রয়েছে। এদের মধ্যে বেশকিছু চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষণীয় যা নিম্নরূপ—

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
১. এরা আকোষীয়। এতে নিউক্লিয়াস নেই।	১. এরা কোষীয়। আদি আকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
২. এরা অতি-আণুবীক্ষণিক, ০.০১ হতে ০.৩ মাইক্রোমিটার।	২. এরা আণুবীক্ষণিক, ০.২ হতে ৫০ মাইক্রোমিটার।
৩. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃত্তি করতে পারে না।	৩. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃত্তি করতে পারে।
৪. কেলাসিত করার পর সজীব কোষে প্রবেশ করে পুনরায় জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে।	৪. কেলাসিত করলে আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে না।
৫. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাংশ নেই, বিপাক ক্রিয়াও দেখা যায় না।	৫. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাংশ আছে এবং বিপাক ক্রিয়া ঘটে।
৬. এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	৬. এদের দেহে এনজাইম থাকে।
৭. ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিডের মধ্যে অবস্থান করে।	৭. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিডের মধ্যে অবস্থান করে না।
৮. কোষে DNA বা RNA যে কোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	৮. কোষে DNA বা RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

প্রমা ▶ ৩১ দাইয়ান ও রাইয়ান দুই বন্ধু, ছুটিতে বাঙামাটি বেড়াতে যায় এবং ফিরে এসে উভয়েই জুরে আক্রান্ত হয়। দাইয়ানের প্রচল্ল জুরের সাথে ঘাড় ও মাংসপেশিতে ব্যথা ও গায়ে র্যাশ দেখা গেছে। কিন্তু রাইয়ানের মাথাব্যথা বমিবর্মি ভাবসহ নিশ্চিত সময় অন্তর অন্তর কাঁপুনি দিয়ে জুর আসে। রক্ত পরীক্ষায় জানা গেল উভয়ের জুরের কারণ আলাদা।

(ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা)

- ক. ইন্টারফেরন কী? ১
- খ. ব্যাকটেরিওফায় বলতে কী বোঝ? ২
- গ. রক্ত পরীক্ষায় কীভাবে নিশ্চিত হওয়া গেল উভয়ের জুরের কারণ আলাদা— ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. রাইয়ানের রোগের জীবাণুর যৌন প্রজনন প্রক্রিয়া আলোচনা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের অধিকাংশ কোষ থেকে নির্গত এক প্রকার প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন হলো ইন্টাফেরন যা ভাইরাসের প্রাথমিক সংক্রমণ ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে থাকে।

খ ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণকারী ভাইরাসই হলো ব্যাকটেরিওফায়। ভাইরাসের বৎসরবৃদ্ধির জন্য জীবিত কোষের প্রয়োজন হয়। ব্যাকটেরিওফায় বৎসরবৃদ্ধির জন্য ব্যাকটেরিয়াকে জীবিত কোষ হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন T₄ ফায় ভাইরাস E.coli ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে সংক্ষ্যাবৃদ্ধি বা বৎসরিক্তার করে।

গ উদ্বীপকে উল্লিখিত দুই বন্ধু দাইয়ান এবং রাইয়ান যথাক্রমে ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত। উদ্বীপকে রোগের লক্ষণ দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য রক্ত পরীক্ষা করা হলো তার সত্যতা পাওয়া যায়।

দাইয়ানের রোগের জন্য দায়ী হলো ডেঙ্গু ভাইরাস যার বাহক Aedes aegypti নামক মশকী। মশকীর লালার সাথে জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ডেঙ্গু ভাইরাসের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। যেমন- সেরোলজি পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তে IgM অ্যাটিবডির উপস্থিতি কিংবা তীব্র সংক্রমিত রক্তে অ্যাটিবডির পরিমাণ চার গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এ জুরে আক্রান্ত হলে রক্তে প্লাটিলেটের সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক নিচে নেমে আসে। এছাড়া রক্ত কণিকার কালচার করে ডেঙ্গু ভাইরাস সনাক্ত করা যায়। অপরদিকে Plasmodium নামক পরজীবী দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগ হয়। অ্যানোফিলিস নামক মশকীর মাধ্যমে এরা মানবদেহে প্রবেশ করে। রক্ত পরীক্ষা করা হয় জিমসা রঞ্জনের মাধ্যমে। এর ফলে অণুবীক্ষণ যত্রে জীবাণুর বিভিন্ন পর্যায়সহ লোহিত কণিকার ক্ষয়ক্ষু দশা দেখা যায়। এছাড়া ম্যালেরিয়া অ্যাটিজেনের ইমুনোক্রোমাটোগ্রাফিক পরীক্ষায় জীবাণু সনাক্ত করা যায়। উপরোক্ত আলোচনা হতে এটা স্পষ্ট রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যায় যে উভয়ের জুরের কারণ আলাদা।

ঘ উদ্বীপকের উল্লিখিত রাইয়ানের রোগের জীবাণু হলো Plasmodium যা ম্যালেরিয়া রোগের জন্য দায়ী। মশকীর ক্রপে Plasmodium যৌনজনন বা গ্যামিটোগনি সম্পন্ন করে।

দৃশ্যন্তের মাধ্যমে অ্যানোফিলিস মশকী ম্যালেরিয়া পরজীবীবাহী ব্যক্তির দেহ থেকে পরজীবীর বিভিন্ন ধাপসহ রক্ত শোষণ করে। ক্রপের পাচক রসের ক্রিয়ায় গ্যামিটোসাইট ছাড়া পরজীবীর অন্য ধাপগুলো হজম হয়ে যায়। এক্সক্যুজেলেশন নামে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক মাইক্রোগ্যামিটোসাইট ৪-৮ টি মাইক্রোগ্যামিট বা পুঁগ্যামিট সৃষ্টি করে। মাইক্রোগ্যামিট বা শুক্রাণুগুলো মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ডিহাণুকে নিষিক্ত করার জন্য সাঁতার কাটতে থাকে। অন্যদিকে ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইটে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এটি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং পরিপূর্ণ লাভের সময় নিউক্লিয়াসটি প্রান্তের দিক সরে যায়। প্রত্যেক ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট থেকে একটি ম্যাক্রোগ্যামিট বা জ্বী গ্যামিট (ডিহাণু) সৃষ্টি হয়। নিষেকের উদ্দেশ্যে ম্যাক্রোগ্যামিটকে প্রহণ করার জন্য ম্যাক্রোগ্যামিটের প্রান্তসীমার একটি অংশ সামান্য ফুলে উঠে কোণ সৃষ্টি করে।

পরিণত প্রতিটি ম্যাক্রোগ্যামিটের চতুর্দিকে অনেক মাইক্রোগ্যামিট এসে ভিড় জমালেও একটি মাত্র মাইক্রোগ্যামিটই নিষেকের সুযোগ পায়। মাইক্রোগ্যামিট প্রথমে ম্যাক্রোগ্যামিটের কোন এর সংলগ্ন হয় এবং পরে ভেতরে প্রবেশ করে। উভয়ের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম একীভূত হলে নিষেক সম্পন্ন হয় এবং কোণটিও অদৃশ্য হয়ে যায়। নিষেকের ফলে ম্যাক্রোগ্যামিট জাইগোট এ পরিণত হয়।

এভাবেই জননকোষ সৃষ্টি ও নিষেক প্রক্রিয়ায় জাইগোট সৃষ্টির মাধ্যমে পরজীবীটি মশকীর ক্রপের ভেতরে যৌন চক্র সম্পন্ন করে।

প্রমা ▶ ৩২ রীমা ও সীমা উভয়ই অণুজীব নিয়ে গবেষণা করছেন। রীমার গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে অকোষীয় রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব, সীমার আদিকোষীয় অণুজীব। রীমার পর্যবেক্ষণে জানা গেল তার অণুজীব সীমার অণুজীবকে ভক্ষণের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা)

- ক. বায়োম কী? ১
- খ. পুষ্প প্রতীক কাকে বলে? ২
- গ. রীমা ও সীমার ব্যবহৃত অণুজীব দুটির পার্থক্য কর। ৩
- ঘ. রীমার পর্যবেক্ষণটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একই ধরনের জলবায়ু, মাটি এবং একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমই হলো বাজোম।

খ যে রেখাচিত্রের সাহায্যে একটি পুঁজের বিভিন্ন স্তরকের অংশগুলোর সংখ্যা, অবস্থান, বিন্যাস, সংযোগ, পুষ্পপত্র বিন্যাস, অমরাবিন্যাস, প্রতিসাম্যতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যাবলী দেখানো হয় তাকে পুষ্প প্রতীক বলে। পুষ্পপ্রতীক মোটামুটি বৃত্তাকার দেখানো হয়।

গ রীমার ব্যবহৃত অণুজীবটি হলো ভাইরাস এবং সীমার ব্যবহৃত অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। নিচে এদের মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো —

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. এরা অকোষীয় এবং এতে নিউক্লিয়াস নেই।	i. এরা কোষীয় এবং এতে আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
ii. এরা সজীব কোষের বাইরে বৎসরবৃদ্ধি করতে পারে না।	ii. সজীব কোষের বাইরে বৎসরবৃদ্ধির করতে পারে।
iii. এতে সাইটোপ্লাজম বা অন্য কোনো কুন্দাঙ্গা নেই।	iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন কুন্দাঙ্গ আছে।
iv. এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	iv. এদের দেহকোষে এনজাইম থাকে।
v. ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে।	v. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে না।
vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

ঘ উদ্বীপকে উল্লিখিত রীমার ব্যবহৃত অণুজীবটি হলো ভাইরাস। ভাইরাসের জীবীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো সজীব কোষের অভ্যন্তরে এরা বৎসরবৃদ্ধি করে। যেমন, T₄ ফায় ভাইরাস E.coli ব্যাকটেরিয়ায় বৎসরবৃদ্ধি করে। T₂ ফায়ের বৎসর বিস্তার —

সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তত্ত্বের সাহায্যে এটি E.coli ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে থাকা স্থানের কোষপ্রাচীর হিস্ত হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তর্ক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় : ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস

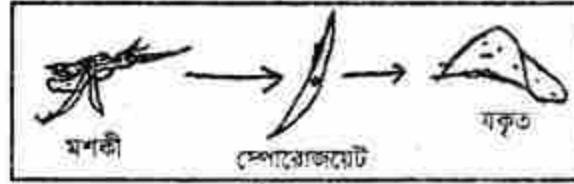
DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষপ্রাচীর ছিঁড়ে করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

উপরের আলোচনা হতে বলা যায়, বীমার অণুজীবটি সীমার অণুজীবকে ভঙ্গণের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্থাৎ বংশবিস্তার করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩



চিত-৩

/বীরপুর পার্স অইডিয়াল ম্যাবরেটোরী ইনসিটিউট, ঢাকা/

- ক. ব্যাকটেরিওফায় কী? ১
- খ. ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার পার্থক্য লেখ। ২
- গ. উদ্ধীপকের চিত-৩ বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্ধীপকের চিত-৪ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাকটেরিয়া ক্ষেত্রকারী ভাইরাস হলো ব্যাকটেরিওফায়

খ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
এরা অকোষীয়, অতি আণুবীক্ষণিক।	এরা কোষীয়, আণুবীক্ষণিক।
সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে
এদের সাইটোপ্লাজম ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অঙ্গাণ নেই।	এদের সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র অঙ্গাণ আছে।
এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	এদের দেহে এনজাইম থাকে।

গ উদ্ধীপকে উল্লিখিত চিত : A হলো T₁ ফায় ভাইরাসের ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। নিচে বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হলো—

পৃষ্ঠলপ্ত হওয়া: T₁ ফায় *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের নির্দিষ্ট স্থানে স্পর্শকর্তৃ এবং স্পষ্টকরের সাহায্যে পৃষ্ঠলপ্ত হয়।

অনুপ্রবেশ: পৃষ্ঠলপ্ত হওয়ার পর স্পর্শক তত্ত্বের সাহায্যে ভাইরাস তার দেহটিকে ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরের যথাস্থানে আবর্ধন করে এবং লাইসোজাইম এনজাইমের কার্যকারিতায় ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে ছিদ্র সৃষ্টি করে। ফায় লেজের প্রোটিন আবরণকে বাইরে রেখে শুধুমাত্র DNA কে ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশ করায়।

সুপ্রকাল: অনুপ্রবেশের ১২-২২ মিনিট সময় পর্যন্ত ভাইরাসের DNA কে পোষক কোষে দেখা যায় না। এখানে ফায় DNA পোষক কোষের ক্রোমাটিন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পোষকের বংশগতীয় ক্রিয়াকলাপ নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়।

ফায়ের অঙ্গ উৎপাদন: কোষের কেন্দ্রাংশ বরাবর পলিমারেজ এনজাইমের সহায়তায় ব্যাকটেরিয়া কোষের নিউক্লিওটাইড ব্যবহার করে নতুন ফায় DNA-র অনুলিপি তৈরি হয়। নতুন ফায় DNA থেকে যে mRNA তৈরি হয় তা পোষক কোষের রাইবোজোমীয় ফ্যাট্টোরিতে (ফায়ের জন্য) প্রোটিনের খোলস তৈরি করে থাকে।

নতুন T₁ ফায় সৃষ্টি: পোষক কোষের অভ্যন্তরে অপ্ট্য �DNA ও প্রোটিন খোলস তৈরির পর এক কপি DNA অণু প্রোটিন খোলসে প্রবেশ করে। শেষে লাইসোজাইম এর সংশ্লেষ ঘটে এবং নতুন কার্যকর T₁ ফায় তৈরি হয়।

বিগলন বা লাইসিস: লাইসোজাইম এনজাইমের অনুরূপ কোনো পদার্থ পোষক কোষ হতে সৃষ্টি হওয়ার কারণেই পোষক কোষ প্রাচীরের নিউক্লিওটিন কমপ্লেক্স জাতীয় যৌগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে কোষ প্রাচীর বিদীর্ঘ হয় এবং অপ্ট্য T₁ ফায় বাইরে নিপত্তি হয়।

ঝ উদ্ধীপকে উল্লিখিত চিত-৩ দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগের প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায় বুৰানো হয়েছে।

মানবদেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর স্পোরোজয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সম্ভাবনে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এতে স্পোরোজয়েট, ক্রিন্টোজয়েট, সাইজন্ট ও ক্রিন্টোমেরোজয়েট এ ধাপগুলো দেখা যায়।

স্পোরোজয়েটগুলো রক্তুরস থেকে যকৃত কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যকৃত কোষ থেকে খাল্য গ্রহণ করে স্পোরোজয়েটগুলো গোলাকার ক্রিন্টোজয়েটে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্রিন্টোজয়েট ক্রমাগত নিউক্লিয়াস বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইজন্ট দশায় উপনীত হয়। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় যাদেরকে মেটাক্রিন্টোমেরোজয়েট বলে। এগুলো আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ঘ করে বের হয়ে আসে।

এভাবেই ম্যালেরিয়া পরজীবী যকৃতে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্নের পর উৎপন্ন মেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃতকোষকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির সৃচনা করে যা পরবর্তীতে সাইজন্ট দশায় পৌছায়। সাইজন্ট দশা থেকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই বিভিন্ন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হওয়ার মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় যাদেরকে মেটাক্রিন্টোমেরোজয়েট বলে। এগুলো আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ঘ করে বের হয়ে আসে।

এভাবেই ম্যালেরিয়া পরজীবী মানবদেহের যকৃতে জীবনকাল সম্পন্ন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ নিচের উদ্ধীপকটি পড় এবং প্রশ্লেগুলোর উত্তর দাও :

X = অকোষীয় অণুজীব যা ডেজু, এইডস প্রভৃতি রোগের জন্য দায়ী।

Y = অনিকোষী, প্রাসমিড বহনকারী অণুজীব যা কলেরা, যজ্ঞা রোগের জন্য দায়ী।

(উত্তর হই স্বতন্ত্র এত কলেজ, ঢাকা)

- ক. মাধ্যমিক পোষক কাকে বলে? ১
- খ. লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্র এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২
- গ. X কীভাবে Y কে ক্ষেত্র করে চিকিৎসহ বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. কৃষিক্ষেত্রে, চিকিৎসাক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে Y এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

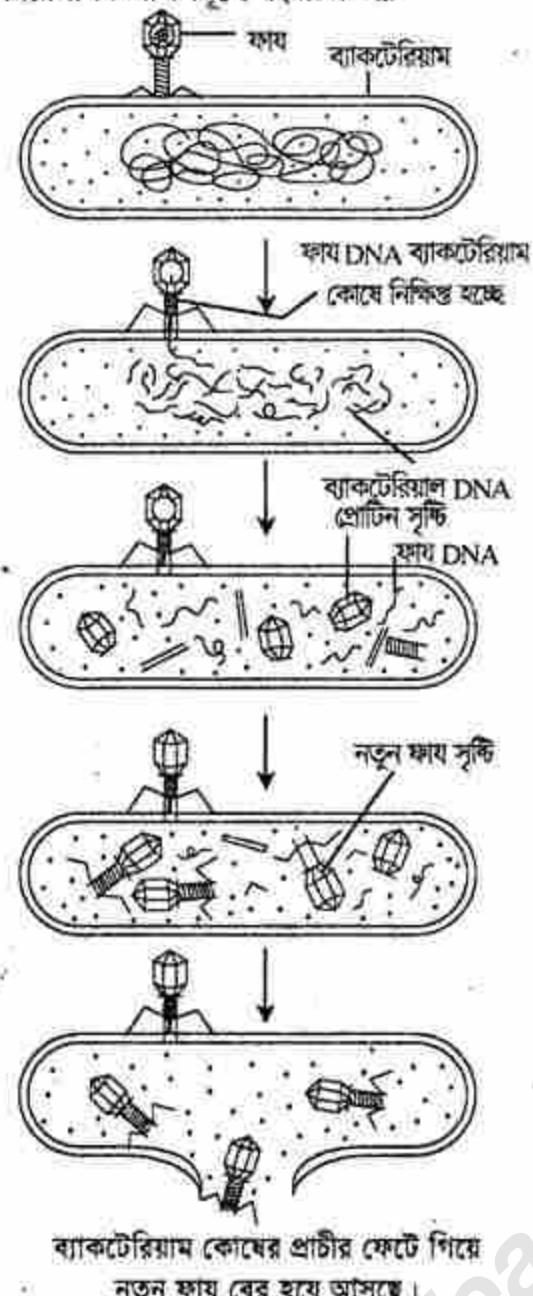
৩৪ নং প্রশ্লেষণের উত্তর

ক ম্যালেরিয়ার জীবাণু যে পোষকের দেহে (মানুষ) অবৈধ জনন সম্পন্ন করে তাকে মাধ্যমিক পোষক বলে।

খ লাইটিক চক্র ও লাইসোজেনিক চক্রের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

লাইটিক চক্র	লাইসোজেনিক চক্র
i. যে প্রক্রিয়ায় ফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় ও ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদ্রোগ ঘটায় তাকে লাইটিক চক্র বলে।	i. এ চক্রে ফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করার পর ভাইরাল DNA অণুটি ব্যাকটেরিয়াল DNA অণুর সাথে যুক্ত হয় এবং একত্রিত হয়ে প্রতিলিপি গঠন করে।
ii. পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া হতে বিদ্রিত হয়।	ii. পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া থেকে বিদ্রিত হয় না।
iii. এ চক্র একবার সম্পন্ন হলে অনেকগুলো ভাইরাসের সৃষ্টি হয়।	iii. এক্ষেত্রে একবার সম্পন্ন হলে মাত্র দুটি ভাইরাস জননেমযুক্ত ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়।
iv. এ চক্রে ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি ভাইরাস দ্বারা প্রোটিন খোলসে প্রবেশ করে।	iv. এ চক্রে ভাইরাসের DNA এর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রোটিন দ্বারা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

গ উদ্বীপকে নির্দেশিত 'X' হলো ভাইরাস এবং 'Y' হলো ব্যাকটেরিয়া। T₂ ফায ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে একটি চক্রের মাধ্যমে ধ্রংস করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। এই চক্রকে লাইটিক চক্র বা বিগলনকারী চক্র বলে। চক্রটি নিম্নলিখিত ধাপসমূহে সংঘটিত হয়-



সংক্ষেপ পর্যায়: ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক ত্বরুর সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিন্ন হয়ে যায়। এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়ায় কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়: ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে T₂ ফায ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে ধ্রংস করে।

ঘ উদ্বীপকে 'Y' দ্বারা ব্যাকটেরিয়াকে নির্দেশ করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে, চিকিৎসাক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হলো-
কৃষিক্ষেত্রে ভূমিকা—

i. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি: মৃত গাছপালা ও প্রাণিদেহ, গোবর কিংবা ময়লা আবর্জনার পচন, বিগলন ও পরিশেষে জৈব পদার্থ মাটির সাথে মিশিয়ে মাটিকে জৈব পদার্থ সমূহ ও উর্বর করে তোলে।

- ii. নাইট্রোজেন সংবন্ধন: *Azotobacter, Clostridium, Pseudomonas* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া বাতাসের গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি লবণে পরিণত করে এবং মাটির উর্বরতা বাঢ়ায়। সিম জাতীয় গাছের মূলে *Rhizobium* নড়িউল সৃষ্টি করে সেখানে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।
- iii. ফলন বৃদ্ধি: জমিতে কাতিপয় ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে ধানের উৎপাদন ৩১.৮% ও গমের উৎপাদন ২০.৮% বৃদ্ধি করা সত্ত্ব হয়েছে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে ভূমিকা -

- i. আ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরিতে : ব্যাকটেরিয়া হতে সাবটিলিন, পলিমিক্রিন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।
- ii. প্রতিষেধক টিকা তৈরিতে : ব্যাকটেরিয়া হতে কলেরা, টাইফয়েড, যন্তা প্রভৃতিরোগের প্রতিষেধক প্রস্তুত করা হয়। ডি.পি.টি. (ডিপথেরিয়া, হৃপিংকাশ ও ধনুস্টকার) রোগের প্রতিষেধক ও ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়।

শিল্পক্ষেত্রে ভূমিকা-

- i. দুধখ শিল্প: *Streptococcus lactis, Lactobacillus* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় দুধ থেকে দই, মাঝন, পনির, ঘোল, ছানা প্রভৃতি তৈরি করা হয়।
- ii. পাট শিল্প: *Clostridium* জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে পাট পচিয়ে সেখান থেকে আঁশ পৃথক করা হয়।
- iii. চামড়া শিল্প: ট্যানারিতে চামড়া থেকে লোম পৃথক করা এবং চামড়াকে নমনীয় করতে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।
- iv. চা, কফি, তামাক শিল্প: ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে চা, কফি, তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এর ফলে বিশেষ স্বাদ ও গন্ধের উৎপত্তি ঘটে।
- v. রসায়ন শিল্প: *Clostridium acetobutylicum* নামক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে শর্করা হতে আসিটোন ও অ্যালকোহল তৈরি হয়। *Acetobacter xylium*-এর সাহায্যে অ্যালকোহল থেকে ভিনেগার এবং *Bacillus lacticacidi* দিয়ে ল্যাক্টিক আসিড তৈরি হয়। এমনকি রন্ধন শিল্পের টেস্টিংসেট তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ A-নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত অনুজীব যা অকোষীয়।

B- আদি কোষী অনুজীব যা এককোষী ও নিউক্লিয়াস-সুগঠিত নয়।

ক. ভাস্কুলার বাস্তুল কি? ১

খ. কাজের ভিত্তিতে ভাজক টিস্যুর শ্রেণিবিভাগ কর? ২

গ. উদ্বীপকের অনুযায়ী A ও B এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৩

ঘ. A কিভাবে B এর মধ্যে বংশ বিস্তার করে? -ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তিদ দেহের অভ্যন্তরে জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর গুচ্ছই হলো ভাস্কুলার বাস্তুল।

খ কাজের ভিত্তিতে ভাজক টিস্যুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (i) প্রোটোডার্ম; (ii) প্রোক্যান্থিয়াম (iii) গ্রাউন্ড মেরিস্টেম।

প্রোটোডার্ম : যে ভাজক টিস্যুর কোষসমূহ উত্তিদেহের তুক সৃষ্টি করে তাকে প্রোটোডার্ম বলে।

প্রোক্যান্থিয়াম : ক্যান্থিয়াম, জাইলেম ও ফ্লোয়েম সৃষ্টিকারী ভাজক টিস্যুকে প্রোক্যান্থিয়াম বলে।

গ্রাউন্ড মেরিস্টেম : শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যুর যে অংশ বারবার বিভাজিত হয়ে উত্তিদ দেহের মূল ভিত্তি তথা কটেজ, মজ্জা ও মজ্জা রশ্মি সৃষ্টি করে তাকে গ্রাউন্ড মেরিস্টেম বলে।

ঘ উদ্বীপক অনুযায়ী A হলো ভাইরাস এবং B হলো ব্যাকটেরিয়া নিচে এদের মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো—

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. এরা অকোষীয় এবং এতে নিউক্লিয়াস নেই।	i. এরা কোষীয় এবং এতে আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
ii. এরা সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	ii. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
iii. এতে সাইটোপ্লাজম বা অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই।	iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ আছে।
iv. এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	iv. এদের দেহকোষে এনজাইম থাকে।
v. ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে।	v. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে না।
vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	vi. এদের কোথে DNA ও RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

৩. উদ্বীপকে উল্লিখিত A অনুজীবটি হলো ভাইরাস এবং B অনুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। নিম্নে ব্যাকটেরিয়ার (*E.coli*) মধ্যে ভাইরাস (T₁ ফায়) এর বংশ বিস্তার ব্যাখ্যা করা হলো—

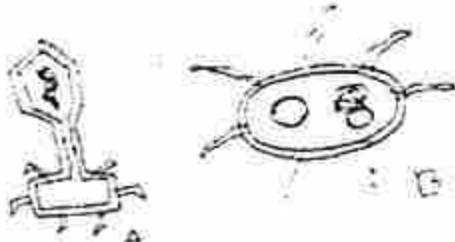
সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E.coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিন্ন হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় : ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে। এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

উপরোক্ত ভাবে A তথা ভাইরাস B তথা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে বংশ বিস্তার করে।

প্রশ্ন ► ৩৬



/ক্লাসিকাল প্রাবলিক স্টুডি ও কলেজ, প্রক্রিয়া, সিলজুরি/

- এন্ডেমিক জীবের কী? ১
- ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ একমুখী ব্যাখ্যা কর। ২
- A অনুজীবটি কীভাবে B অনুজীবকে ধ্বংস করে ব্যাখ্যা কর। ৩
- B প্রেগিন অনুজীব ধানের এক ধরনের রোগ সৃষ্টি করে।
রোগের নাম, লক্ষণ, দায়ী অনুজীবের নাম এবং প্রতিকার নিখ। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যেসব জীবের স্বাভাবিক বিস্তৃতি নিদিষ্ট প্রাণিভোগোলিক অঞ্চলের বাইরে পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না সেসব জীবই হলো এন্ডেমিক জীব।

ব. ইকোসিস্টেমের মধ্যে শক্তির একমুখী চলনকে শক্তি প্রবাহ বলে। সূর্য থেকে যে গতিশক্তি ইকোসিস্টেমে প্রবেশ করে তার একটি অংশ উত্তিন কর্তৃক সালোকসংযোগে প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং পুরোজোর মতো বিভিন্ন জৈব অণুতে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা হয়। কোষীয় খসনের মাধ্যমে জৈব অণুগুলো ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয় যা শরীরের উত্তোলন স্থিতিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্রহ্ম হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিম্নমানের শক্তি হিসেবে পরিবেশে ফিরে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ শক্তি শূন্যে চলে যায়। কাজেই বলা যায় শক্তি প্রবাহ একমুখী।

গ. উদ্বীপকে নির্দেশিত 'A' অনুজীবটি হলো T₁, ফায় ভাইরাস এবং 'B' অনুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। T₁ ফায় ভাইরাস লাইটিক চক্রের মাধ্যমে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে এবং সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। চক্রটি নিম্নলিখিত পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়-

সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষ প্রাচীর ছিন্ন হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় : ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : এই পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ভাইরাসগুলো বের হয়ে আসে।

এভাবে T₁ ফায় ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

ঘ. উদ্বীপকে নির্দেশিত 'B' অনুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া ধানের এক ধরনের বিশেষ রোগ সৃষ্টি করতে পারে। রোগটির নাম-ধানের লিফ ব্রাইট রোগ। এ রোগের জন্য দায়ী অনুজীব হলো- *Xanthomonas oryzae*।

রোগটির সক্ষণ :

- পাতায় ডেজা অর্ধস্বচ্ছ লম্বা দাগের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাতার শীর্ষে শুরু হয়।
- দাগ ক্রমশ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড় হতে থাকে এবং টেউ খেলানো প্রাপ্ত বিশিষ্ট হয়।
- দাগগুলো ক্রমশ হলুদ বা হলদে সাদা বর্ণের হয়।
- সকালে দুধের মতো সাদা বা অর্ধস্বচ্ছ রস আক্রমণ স্থান থেকে ধীরে প্রবাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্যাপ্রোফাইটিক ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষত স্থান ধূসর বর্ণের হয়।
- আক্রমণ বেশি হলে পাতা দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং গাছটি মারা যায়।
- ধানের ছড়া বন্ধ্যা হয়, তাই ফলন ৬০% পর্যন্ত কম হতে পারে।
- ধানের শীষে কোনো ফলন হয় না।

রোগটির প্রতিকার :

- বীজই রোগ জীবাণুর প্রধান বাহন। ব্রিচিং পাউডার (100mg/ml) এবং জিডেক সালফেট (2%) দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগাক্রমণ বহুলভাবে কমে যায়।
- কপার যৌগ, আল্টিবায়োটিক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ভালো সুফল আনে না, কিছুটা উপকার হয়।
- গাছ আক্রমণ হলে ক্ষেত্রে হেষ্টের প্রতি ২ কেজি ব্রিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।
- ফিনাইল সালফিউরিক অ্যাসিটেড এম. ক্লোরামফেনিকল ১০-২০ লিটার পরিমাণে মিশিয়ে আক্রমণ ক্ষেত্রে ছিটালে রোগ নিয়ন্ত্রণ হয়।
- বীজ বপনের আগে ০.১% সিরিসান দ্রবণে ৮ ঘণ্টা ডিজিয়ে রাখলে বীজবাহিত সংক্রমণ রোধ হয়।

প্রশ্ন ৩৭ গ্রীষ্মের ছুটিতে মনিকা রাজ্যামাটি বেড়াতে গেল। ফেরার কয়েকদিন পরপর তার কান্দুনি দিয়ে জ্বর আসে। ডাক্তার কিন্তু পরীক্ষা করে দেখলেন তার শরীরে রক্ত ব্রহ্মতা দেখা দিয়েছে। ডাক্তার আরো বললেন, এক কোষী প্রোটোজেয়া এ রোগের জন্য দায়ী।

(এই ইচ্ছিক কলেজ পাইপলাইন)

ক. ফায় কী?

খ. ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ৪টি পার্থক্য লিখ।

গ. উদ্বিপক্ষে অণুজীবটির মানুষের লোহিত রক্ত কণিকায় তার জীবন চক্রের যে ধাপগুলো উৎপন্ন করে তার সচিত্র বর্ণনা দাও।

ঘ. উদ্বিপক্ষে উল্লেখিত অণুজীবটির জীবনে দুইটি পোষকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সব ভাইরাস জীবদেহে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে তারাই ফায়।

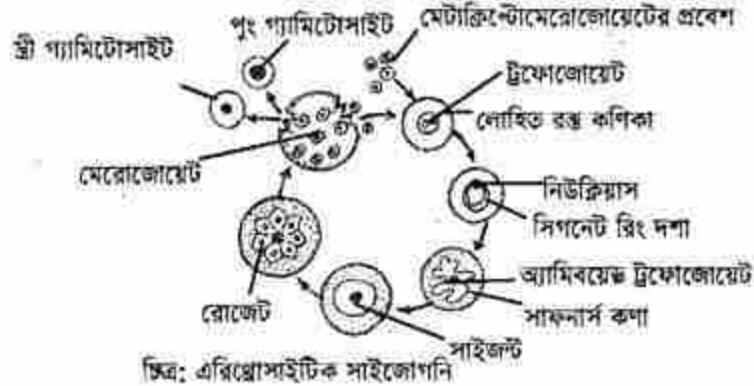
খ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার চারটি পার্থক্য নিম্নরূপ :

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
এরা অকোষীয়, অতি আণুবীক্ষণিক।	এরা কোষীয়, আণুবীক্ষণিক।
সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
এদের সাইটোপ্লাজম ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অঙ্গাণু নেই।	এদের সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র অঙ্গাণু আছে।
এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে।	এদের দেহে এনজাইম থাকে।

গ উদ্বিপক্ষের অণুজীবটি মানুষের লোহিত রক্ত কণিকায় তার জীবন চক্রের এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পূর্ণ করে। নিচে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির ধাপগুলোর সচিত্র বর্ণনা করা হলো:—

- মাইক্রো-মেটাক্রিটোমেরোজয়েটগুলো যকৃত কোষ থেকে লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে এবং খাদ্য প্রহরণ করে স্ফীত ও গোলাকার হয়। এই দশাকে ট্রফোজয়েট দশা বলে। এ অবস্থায় জীবাণুর দেহে ক্ষুদ্র একটি কোষ গহন ও ছোট একটি নিউক্লিয়াস দেখা যায়। এটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী দশা।
- কোষ গহনরটি ধীরে ধীরে বড় হয় ও নিউক্লিয়াসটি একপাশে সরে যায়, ফলে জীবাণুটি একটি আংটি আকৃতি লাভ করে। এই অবস্থাকে সিগনেট রিং বলা হয়।
- এ দশায় জীবাণু ক্ষণপদবিশিষ্ট *Amoeba* এর আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাই এ দশাকে অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েট বলে। এ সময় লোহিত কণিকাটি আকারে স্ফীত হয় এবং এর সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়। এ গুলোতে সাফল্যার্স দানা (কণা) বলে। রক্ত কণিকায় সাফল্যার্স দানার উপস্থিতি দেখে ম্যালেরিয়া রোগ শনাক্ত করা হয়।
- অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েট দশার কোষস্থ নিউক্লিয়াস বারবার বিভাজনের মাধ্যমে ১২-২৪টি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এ অবস্থাকে সাইজন্ট বলা হয়। এর সাইটোপ্লাজমে হিমোজয়েন নামক বর্জ্য পদার্থ জমা হয়।
- সাইজন্ট দশার প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমামেম্ব্রেনসহ মেরোজয়েট-এ পরিণত হয়। মেরোজয়েটগুলো গোলাপের পাড়ির ন্যায় দুই স্তরে সজ্জিত হয়। এ দশাকে রোজেট বলে।
- পরবর্তী অবস্থায় লোহিত রক্ত কণিকা ভেঙে যায় এবং মেরোজয়েটগুলো প্রাজ্ঞায় বের হয়ে আসে। মেরোজয়েট রক্তস্ন্তানে ঢুকে গেলে রক্তের শ্বেত রক্ত কণিকাগুলো তাকে প্রতিরোধ করতে চেষ্ট করে। এসময় রক্তে প্রচুর পরিমাণে পাইরোজেন নামক রাসায়নিক পদার্থ জমা হয় এবং এর প্রভাবেই দেহে জ্বর আসে। সমগ্র চক্রটি সম্পন্ন হতে প্রায় ৪৮-৭২ ঘণ্টা সময় লাগে।

- মুক্ত মেরোজয়েট নতুন লোহিত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করে এবং একইভাবে চক্রটি পুনরাবৃত্তি ঘটায়।
- কতিপয় মেরোজয়েট গ্যামিটোসাইটে পরিণত হয়। গ্যামিটোসাইট দুই প্রকার। পুঁ গ্যামিটোসাইট বা মাইক্রোগ্যামিটোসাইট এবং স্তৰী গ্যামিটোসাইট বা ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট। পুঁ গ্যামিটোসাইটগুলো আকারে ছোট কিন্তু এর নিউক্লিয়াস বড় এবং স্তৰী গ্যামিটোসাইটগুলো আকারে বড় কিন্তু এর নিউক্লিয়াস ছোট হয়। স্তৰী ও পুঁ গ্যামিটোসাইটগুলো পোষক দেহের প্রাণীয় রক্তনালীতে অবস্থান করে।



ঘ উদ্বিপক্ষের রোগের অণুজীবটি *Plasmodium vivax*। ম্যালেরিয়া রোগের এ জীবাণুটির জীবন চক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজন। যথা— মানুষ ও মশকী। মশকীর দেহে অণুজীবটির যৌন এবং মানুষের দেহে অণুজীবটির অযৌন দশা সম্পন্ন হয়। এখানে মশকীর দেহে প্রথমে দু'প্রকার গ্যামিটোসাইট প্রবেশ করে এবং তারা মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে ডিপ্লায়েড জাইগোট। জাইগোটটি শেষে মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে স্পেরোজয়েট উৎপন্ন করে। উৎপন্ন স্পেরোজয়েট পুনরায় মশকীর দেহে আক্রমন না করে বরং মশকীর দংশনের মাধ্যমে মানুষের দেহে চলে আসে। এরপর স্পেরোজয়েট প্রথমে যকৃত কোষে ও পরে লোহিত রক্তকণিকায় আক্রমন করে এবং সেখানে অযৌন জনন ঘটায়। তবে মানুষের দেহে পরজীবীটি শুধুমাত্র অযৌন চক্রের মাধ্যমে বারবার সাইজোগনি সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু যৌন চক্রের জন্য অবশ্যই মশকীর প্রয়োজন। সুতরাং আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, উদ্বিপক্ষের অণুজীবটির অর্থাৎ *Plasmodium vivax* এর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ৩৮ শিহারের জ্বর। ডাক্তার তার রক্ত পরীক্ষা করে বললেন। এক ধরনের এককোষী জীবাণুর কারণে জ্বর এসেছে। এই জীবাণু মানুষের যকৃত কোষ ও লোহিত কণিকা ধ্বংস করে। সচেতন থাকলে এই জীবাণু থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

- ক. ব্যাকটেরিওফায় কি?
- খ. ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ লিখ।
- গ. উদ্বিপক্ষে উল্লেখিত জীবাণু দ্বারা মানুষের যকৃত কোষ ধ্বংসের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্বিপক্ষের শেষোক্ত লাইনটি ব্যাখ্যা কর।

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাসই হলো ব্যাকটেরিওফায়।

ঘ ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ—

- হঠাতে প্রচন্ড জ্বর।
- তীব্র মাথা ব্যথা ও চোখের পেছনে ব্যথা।
- কোমর ও মাংসপেশিতে প্রচন্ড ব্যথা।
- অনেক সময় দাঁতের মাড়ি ও নাক দিয়ে রক্তকরণ হয়।

গ উদ্বিপক্ষে উল্লেখিত জীবাণুটি হলো ম্যালেরিয়া জ্বরের বাহক *Plasmodium*। এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষের যকৃত কোষ ধ্বংস হয়। নিচে মানুষের যকৃত কোষ ধ্বংসের কারণ ব্যাখ্যা করা হলো—

Plasmodium vivax পরজীবী আক্রান্ত *Anopheles* মশকীর দংশনের মাধ্যমে মানুষের দেহে এ পরজীবী প্রবেশ করে। মশকীর লালারসে এ পরজীবীর স্পেয়ারোজয়েট দশা থাকে যা দংশনের মাধ্যমে মানুষের রক্তে প্রবেশ করে। মানবদেহে স্পেয়ারোজয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সন্তানে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। স্পেয়ারোজয়েটগুলো রক্তরস থেকে যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যা যকৃত কোষ ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এছাড়াও যকৃত কোষ থেকে স্পেয়ারোজয়েটগুলো খাদ্য গ্রহণ করে গোলাকার হয়, এটাও যকৃত কোষ ধ্বংসের কারণ। ম্যালেরিয়া পরজীবী যকৃতে প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনি সম্পূর্ণের পর আবারও উৎপন্ন মেরোজয়েটগুলো নতুন যকৃত কোষকে আক্রমন করে এবং হেপাটিক সাইজেগনি দশার শেষের দিকে আক্রান্ত যকৃত কোষ বিদীর্ণ হয়, যেটা মূলত যকৃত কোষ ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

১ উদ্দীপকে বণিত রোগটি হলো ম্যালেরিয়া জ্বর। স্তৰি *Anopheles* মশকী এই রোগের জীবাণু বহন করে থাকে এবং এক রোগী থেকে অন্য সুস্থ দেহে সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। এজন্য বলা যায়, মশকী নিধনই ম্যালেরিয়া জ্বর প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। মশকী নিধনের জন্য মশকীর প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস করা, প্রজনন ক্ষেত্রে নিয়মিত ঔষধ ছিটানো, মশার লার্ভা ধ্বংস করা হয়। জলাশয়ে মশকীর লার্ভা উচ্চণকারী গাঢ়ী, চেলা, বলিশা মাছ চাষ করা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া ঘরে মশারী ব্যবহার, মশকী নিধনকারী রাসায়নিক স্পেন করা, মশকীরোধী ক্রিম ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া বাড়ির আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে তুলসি গাছ লাগালে মশকীর উপন্থব কম হয়। উপরিউক্ত সতর্কতাসমূহ মেনে চললে এ রোগ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব।

প্রশ্ন **৩৯** রনির প্রচণ্ড জ্বর ও মাথা ব্যথা হলো। ৪৮ ঘন্টা পর পর তার কানুনি দিয়ে জ্বর আসে। অন্যদিকে সেতুর প্রচণ্ড জ্বরসহ শরীরে লালচে রঙের র্যাশ দেখা গেল। ভাক্তার দেখে বললেন, দুটি জ্বর দুটি পৃথক অণুজীব দ্বারা সৃষ্টি।

/সরকারি স্পিটি কলেজ, চট্টগ্রাম/

- ক.** সিগনেট রিং কী? **১**
- খ.** হেপাটাইটিস বলতে কী বুঝ? **২**
- গ.** সেতুর জ্বরের জন্য দায়ী অণুজীবটির বংশবিস্তারে পোষকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। **৩**
- ঘ.** রনির জ্বরের জন্য দায়ী অণুজীবটি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্বর সৃষ্টি করে তা ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ কর। **৪**

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ম্যালেরিয়া পরজীবীর ট্রাফোজয়েটের নিউক্লিয়াস এক পাশে অবস্থান করায় আংটির মত যে আকৃতির সৃষ্টি হয় তাই সিগনেট রিং।

খ সাধারণত লিভার প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলা হয়। ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লিভার প্রদাহ হলে তাকে ভাইরাল হেপাটাইটিস বলা হয়। এটি জড়সের অন্যতম প্রধান কারণ। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৩% এবং বাংলাদেশের প্রায় ৪০ লক্ষ লোক এ রোগে আক্রান্ত। ৮৫% ক্ষেত্রে এ ভাইরাস লিভারের স্থায়ী আক্রমণ গড়ে তোলে। অধিকাংশ হেপাটাইটিস হেপাটাইটিস-B ভাইরাসের আক্রমণে হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপক অনুসারে, সেতুর প্রচণ্ড জ্বরসহ শরীরে লালচে রঙের র্যাশ দেখা গিয়েছে। সুতরাং সেতু ডেজু জ্বরে আক্রান্ত। সেতুর জ্বরের জন্য দায়ী অণুজীবটির বংশবিস্তারে পোষকের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হলো—

ডেজু একটি ভাইরাস জনিত রোগ। এই ভাইরাসের জীবাণুর নাম ফ্ল্যাডিভাইরাস। এটি একটি RNA ভাইরাস। এই ভাইরাসের বাহক হলো *Aedes aegypti* নামক মশকী, আর এর পোষক দেহ হলো মানুষ।

স্তৰি মশকীর ডিম্বাণুর পরিস্কৃতনের জন্য উঁচু রক্তবিশিষ্ট প্রাণীর রক্ত প্রয়োজন। তাই কেবলমাত্র মশকীরই রক্ত পান করে এবং জীবাণুর বিস্তার ঘটায়। নিম্নশ্রেণির জীবেরা বার বার অযৌন পর্যবেক্ষণে বংশবিস্তারের কারণে তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। তাই তারা মাঝে যৌন জননে আবশ্যিক হয়ে জীবনীশক্তি পুনরুদ্ধার করে। এটি নিম্নশ্রেণির জীবদের Evolutionary অভিযোগন। ফ্ল্যাডিভাইরাসের ক্ষেত্রে যৌন জনন *Aedes* মশকীতে এবং অযৌন জনন মানবদেহে ঘটে থাকে। এভাবে ফ্ল্যাডিভাইরাস জীবনচক্র সম্পন্ন করে। শুধুমাত্র একটি পোষক দ্বারা জীবন চক্র সম্পন্ন করতে পারেন।

সুতরাং, উপর্যুক্ত আলোচনা হতে জানা যায়, অণুজীবটির বংশ বিস্তারে পোষকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

ঘ রনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত। ধারণা করা হতো যে পরজীবীর দেহ থেকে নিঃসৃত হিমোজয়েন নামক বিষাক্ত রঞ্জক পদার্থের কারণে বা কোনো বিষবন্ত ক্ষরণের ফলে মানুষের দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং জ্বর আসে। কিন্তু বর্তমান ধারণা অনুযায়ী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষের দেহের লোহিত রক্ত কণিকার প্রাচীর ভেঙে মেরোজয়েটগুলো রক্তরসে প্রবেশ করে। মেরোজয়েটগুলো বহিরাগত বস্তু যা রক্তের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে দেয়। এ বহিরাগত বস্তুগুলোকে ধ্বংস করার জন্য রক্তের শ্বেতকণিকা পাইরোজেন নামক এক প্রকার পদার্থ ক্ষরণ করে। শ্বেতকণিকা যখন অতিরিক্ত পাইরোজেন ক্ষরণ করে তখন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশ, বিশেষ করে তাপসংবেদী কোষগুলো উদ্বিষ্ট হয়। তখন প্রোস্টাগ্লাডিন, মনোঅ্যামাইন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ বেড়িয়ে আসে। এ খবর হাইপোথ্যালামাসের পেছন দিকটায় পৌছালে ভেসোমোট মায়ুতন্ত্র উভেজিত হয়। এ উভেজনা দেহের প্রান্তীয় অংশের রক্তনালিগুলোকে সংকুচিত করে ফলে দেহ থেকে অতিরিক্ত তাপ বের হতে পারে না। এ কারণেই দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। দেহের এ তাপ বৃদ্ধিকে জ্বর বলে। ঠিক এ কারণেই রনির শরীরে জ্বর আসে।

প্রশ্ন **৪০** রনি ও মনি পরীক্ষা শেষে শহরে মাঝারি বাড়িতে বেড়াতে গেলে স্থানহ্যানেক পর দেখা গেল রনির প্রচণ্ড জ্বরসহ শরীরে লালচে রঙের র্যাশ এবং মনির বমিসহ চালধোয়া পানির মত মল ত্যাগ করার লক্ষণ দেখা দিল।

- ক.** জেনেটিক কোড কী? **১**
- খ.** সাইকাসের মূলকে কোরালয়েড মূল বলা হয় কেন? **২**
- গ.** উদ্দীপকে উল্লেখিত রনি ও মনির রোগের নাম উল্লেখসহ রোগ নিয়ন্ত্রণে ভাক্তারের পরামর্শগুলো লিখ। **৩**
- ঘ.** উভয়ের রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবেশীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। **৪**

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাইট্রোজেন বেসের যে গ্রুপ কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডের সংকেত গঠন করে সেই গ্রুপই হলো জেনেটিক কোড।

খ সাইকাস এর প্রধান মূল বিনষ্ট হওয়ার পর সেখান থেকে অস্থানিক মূল তৈরি হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে হ্যাগ ও কতক সায়ানোব্যকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। যার ফলে আক্রান্ত মূলগুলো স্বাভাবিক সরু না হয়ে সামুদ্রিক প্রবাল বা কোরালের মতো আকার ধারণ করে। এ কারণে সাইকাসের মূলকে কোরালয়েড মূল বলে।

গ রনি ও মনির রোগ লক্ষণগুলো দেখে বোধ করা যায় রনি ডেজু জ্বরে ভুগছে এবং মনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

ডেজু নিয়ন্ত্রণে ভাক্তারের পরামর্শ :

- i. ডেজু মশা (*Aedes aegypti*) দিনের বেলায় কামড়ায়, তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে।
- ii. ঘরে বা আশে পাশে কোনো পাত্রে বেশি দিন যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কারণ সেখানে *Aedes* মশকী বংশ বিস্তার করতে পারে।

- iii. ডেজু জুরে আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যেতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে।
- iv. জুর ও ব্যাথা কমানোর জন্য কেবলমাত্র প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ খাওয়া যেতে পারে, তবে অ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধ পরিহার করতে হবে।

কলেরা নিয়ন্ত্রণে ডাক্তারের পরামর্শ:

- বিশুদ্ধ পানি বা ভালভাবে ফুটানো পানি পান করতে হবে।
- পচা, বাসী বা খোলা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- খাবার গ্রহণের পূর্বে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
- কলেরা আক্রান্ত হলে দুট রোগীকে হাসাপাতালে নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হবে।
- রোগীকে বার বার খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

৪ উদ্দীপকের রনি ও ঘনির রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডেজু ও কলেরা রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাড়ির আশপাশ অপরিস্কার থাকলে সেখানে ডেজু মশার উপন্থ বেড়ে যেতে পারে। আবার ঘরের ভেতর বা চারিপাশে কোনো পাত্রে অনেকদিন পানি জমে থাকলে সেখানে মশকী ডিম দিতে পারে, যা থেকে মশার বংশবৃক্ষ ঘটে। এছাড়া ফ্রিজের তলদেশের বা এয়ারকুলারের নিচের এমনকি ফুলের টবের পানি অনেকদিন পরিষ্কার না করলে সেখানে ডেজু মশা তার বংশ বৃক্ষ ঘটায়। ফলে ডেজু রোগের বিস্তার দ্রুত বৃক্ষ পায়।

আবার কলেরা রোগ সাধারণত পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। কলেরা রোগীর মল বা বমি নিদিষ্ট স্থানে না ফেললে তা যদি পানির সঙ্গে মিশে যায় তবে সেখান থেকে রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারে। এছাড়া নোংরা পরিবেশে মাছির উপন্থ বেড়ে গেলে এবং খাবার খোলা থাকলে সেখানে মাছি বসে ফলে তার মাধ্যমেও কলেরা রোগ ছড়াতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ উভয় প্রকার রোগ বিস্তারে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ গ্রুপ A : ইনফ্লুয়েঞ্চা, বসন্ত, জলাতঙ্ক

গ্রুপ B : ম্যালেরিয়া

/বি এ এক শাখাল কলেজ, চট্টগ্রাম/

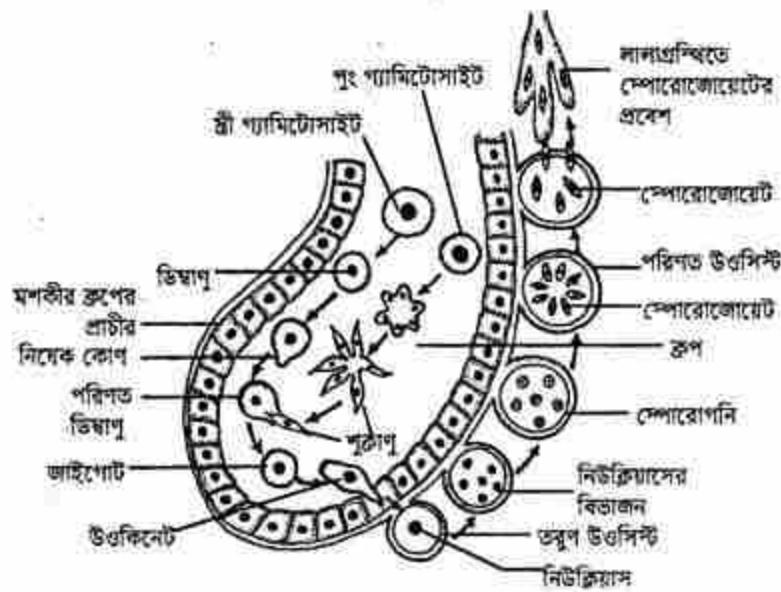
- ভিরিয়ন কী? ১
- জনুক্রম কাকে বলে? ২
- গ্রুপ 'B'-এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের যৌগ জনন প্রক্রিয়ার চিহ্নিত চিত্র আঁক। ৩
- গ্রুপ-A-এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের শুধুমাত্র ক্ষতিকারক নয়, উপকারীও বটে—কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ধিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমণক্ষম সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাই হলো ভিরিয়ন।

খ কোনো জীবের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ের সাথে স্পেরোফাইটিক পর্যায়ের যে পালাক্রম ঘটে তাকে জনুক্রম বলে। উন্নত জীবের জনুক্রমে গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ের পুঁ ও স্তৰী গ্যামিট মিলিত হয়ে স্পেরোফাইটিক পর্যায়ের প্রথম কোষ জাইগোট সৃষ্টি করে।

গ গ্রুপ-B এর রোগটি হলো ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব Plasmodium-এর যৌন জনন প্রক্রিয়ার চিহ্নিত চিত্র অংকন করা হলো—



চিত্র : মশকীর দেহের ম্যালেরিয়া জীবনচক্রের চিত্রণ

গ গ্রুপ-A এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব হলো ভাইরাস। ভাইরাস ডিগ্নিদ ও প্রাণীদেহে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। তাই এটি ক্ষতিকারক অণুজীব। তবে ভাইরাস তথা অণুজীবটি শুধু যে ক্ষতি করে তা নয় বিভিন্নভাবে উপকারণ করে থাকে। যেমন—

বসন্ত, পোলিও, প্লেগ এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক ভাইরাস থেকেই তৈরি হয়। ভাইরাস থেকে জড়িস রোগের টিকা আবিষ্কার করা হয়েছে। জিন প্রকৌশল গবেষণায় বর্তমানে ভাইরাসকে বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া বেশ কিছু ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণেও ভাইরাস ব্যবহার করা হচ্ছে। ফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ধ্রংস করে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে থাকে। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনেও ভাইরাসের ব্যবহার রয়েছে। শুধু তাই নয় টিউলিপ ফুলের সৌন্দর্য বৃক্ষিতে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটানো হয়ে থাকে। সূতরাং উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় উদ্দীপকের গ্রুপ-B এর রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের অর্থাৎ ভাইরাস শুধুমাত্র ক্ষতিকারক নয়, উপকারীও বটে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ A-একটি আদিকোষীয় অণুজীব যা মূলত এককোষী এবং ইহার নিউক্লিয়াস সুগঠিত নয়। এতে আবার একটি অতিরিক্ত বৃত্তাকার ডিএনএ আছে।

B-একটি বাধ্যতামূলক অকোষীয় পরজীবী যা জীবদেহে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। /পরীক্ষাত্ত্বের সরঞ্জারি কলেজ/

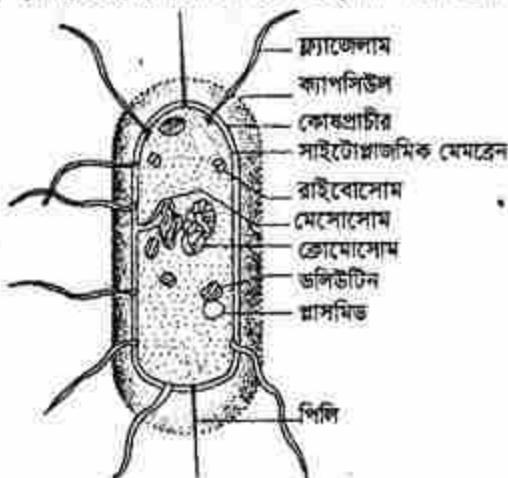
- ক. ভিরিয়ন কি? ১
- খ. ডেজু কেন মানুষের জন্য বিপদজনক? ২
- গ. A- অণুজীবের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর। ৩
- ঘ. B- কে কোন কোন ক্ষেত্রে কীভাবে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা যায় বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিউক্লিক অ্যাসিড ও একে ধিরে অবস্থিত ক্যাপসিড সমন্বয়ে গঠিত এক একটি সংক্রমণক্ষম সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাই হলো ভিরিয়ন।

খ ডেজু একটি মশাবাহিত সংক্রামক রোগ। সাধারণ ডেজুজুর মানুষের জন্য ততটা বিপদজনক না হলেও হেমোরেজিক ডেজুজুর মানুষের জন্য বিপদজনক। সাধারণ ডেজুজুরের জটিলতা থেকে হেমোরেজিক ডেজুজুর দেখা যায়, ফলে এ অবস্থায় কয়েকদিন পর রোগীর নাক, মুখ, দাঁতের মাড়ি ও দ্বৃকের নিচে রক্তক্ষরণ দেখা যায়। রক্তে প্লাটিলেট ভীষণ কমে যায়। লসিকানালি ও রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পায়খানার সাথে রক্ত যেতে পারে, রক্ত বমি হতে পারে, চোখে রক্ত জমাট বাধতে পারে। পরবর্তীতে রক্তক্ষরণ বেড়ে গেলে রোগী শক এ চলে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে। একে ডেজু শক সিন্দ্রোম বলে। এ কারণে ডেজুজুর বিশেষত হেমোরেজিক ডেজুজুর মানুষের জন্য বিপদজনক।

৬ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' বৈশিষ্ট্য দ্বারা ব্যাকটেরিয়াকে নির্দেশ করা হয়েছে। নিম্নে ব্যাকটেরিয়ার চিহ্নিত চিত্র অংকন করা হলো—



চিত্র : একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ

৭ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' বৈশিষ্ট্য দ্বারা ভাইরাসকে নির্দেশ করা হয়েছে। মানব কল্যাণে ভাইরাসকে যেভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিচে বিশেষণ করা হলো—

- প্রতিষেধক তৈরিতে: বসন্ত, পোলিও, প্লেগ, টাইফয়েড, জলাতঙ্গ প্রভৃতি রোগের টিকা বা ভার্সিন তৈরিতে ভাইরাসের বাণিজ্যিক ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- জিনতত্ত্ব ও আণবিক জীববিদ্যায়: জিনতত্ত্বায় এবং আণবিক জীববিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষামূলক গবেষণায় ভাইরাস ব্যবহৃত হয়।
- ব্যাকটেরিওফায় হিসেবে: কিন্তু ভাইরাস মানুষের জন্য ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াকে খৎস করে আমাদের উপকার করে।
- ওষুধ হিসেবে: টাইফয়েড, কলেরা, রক্ত আঘাত, প্লেগ ইত্যাদি নামক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে কয়েকটি ফায় ভাইরাস ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- পোকামাকড় দমনে: ভাইরাসকে কতিপয় ক্ষতিকারক ও বিপদজনক কীটপতঙ্গ দমনে ব্যবহার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে Nuclear Polyhydroysis Virus-কে পতঙ্গনাশক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।
- বিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণে: জীব সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে ভাইরাস, কারণ ভাইরাসে একই সাথে জড় এবং জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি রয়েছে।
- ফুলের সৌন্দর্য বৃন্ধিতে: টিউলিপ ফুলের পাপড়িতে বিভিন্ন ছাপ মূলত ভাইরাসের আক্রমণ। ছাপযুক্ত টিউলিপ ফুল সৌন্দর্যের জন্য বিশেষ্যাত।
- জৈবিক নিয়ন্ত্রণ: বর্তমানকালে জৈবিক নিয়ন্ত্রণে ভাইরাসকে ব্যবহার করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় ঘরগোশ নিয়ন্ত্রণে মিরোভাইরাসকে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ৪৩ লুসাইবা গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে বাসায় আসার কিছুদিন পর তীব্র কাঁপুনিসহ জ্বর আসল। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কিছুক্ষণ পর প্রচুর ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। রক্ত পরীক্ষায় দেখা গেল লুসাইবা রক্ত স্ফলতায় ডুগছে।

(চার্টগ্রাম সরকারি মালিলা কলেজ)

- প্রজাতি কি? ১
- বৈজ্ঞানিক নাম লিখ-সুন্দরী, করবী। ২
- উদ্দীপকে উল্লিখিত জ্বরের অণুজীবটি লুসাইবা রক্তে যে ধাপটি সম্পন্ন করে তার চিহ্নিত চিত্র অংকন কর। ৩
- অণুজীবটির জীবনে দুইটি পোষকের প্রয়োজন ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রজাতি হলো সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের মিল সম্পন্ন একদল জীব যাদের মধ্যে যৌন মিলনে উর্বর বংশধর উৎপন্ন হয়।

খ সুন্দরীর বৈজ্ঞানিক নাম— *Heritiera fomes*.

করবীর বৈজ্ঞানিক নাম— *Nerium odoratum*.

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগটি হলো ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুর নাম *Plasmodium vivax*। এ পরজীবীটি লুসাইবাৰ রক্তে এৱিশোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন কৰে। এ ধাপটির চিহ্নিত চিত্র নিম্নরূপ—



চিত্র: এৱিশোসাইটিক সাইজোগনি

ঝ উদ্দীপকে উল্লিখিত লুসাইবাৰ ম্যালেরিয়া রোগের জন্য দায়ী অণুজীবটি হলো *Plasmodium vivax*। অণুজীবটির জীবনচক্র সম্পন্ন কৰতে মানুষের দেহ এবং মশকী-এন্দুটি পোষকের প্রয়োজন। কারণ এ অণুজীবটির জীবনচক্রের যৌন দশাটি সম্পন্ন হয় মশকীর দেহে এবং অযৌন দশাটি সম্পন্ন হয় মানুষের দেহে। এখানে মশকীর দেহে প্রথমে দু'প্রকার গ্যামিটোসাইট প্রবেশ কৰে সেখানে তারা মিলিত হয়ে জাইগোট উৎপন্ন কৰে। জাইগোটটি শেষে মায়োসিস বিভাজনৰ মাধ্যমে স্পোরোজয়েট উৎপন্ন কৰে। উৎপন্ন স্পোরোজয়েট পুনৰায় মশকীৰ দেহে আক্রমণ কৰে না বৰং মানুষের দেহে চলে আসে। এৱে স্পোরোজয়েট প্রথমে যকৃত কোষ ও পরে লোহিত রক্তকণিকা আক্রমণ কৰে এবং সেখানে অযৌন জনন ঘটায়। তবে মানুষের দেহে পরজীবী শুধুমাত্র অযৌন চক্রের মাধ্যমে বাৰবাৰ সাইজোগনি সম্পন্ন কৰতে পাৰে। কিন্তু যৌন চক্রের জন্য অবশ্যই মশকী প্রয়োজন। সুতৰাং আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাৱে বুৰু যায় যে, অণুজীবটিৰ জীবনে দুইটি পোষকেৰ প্রয়োজনীয়তা অপৰিসীম।

প্রশ্ন ৪৪ উচ্চতর গবেষণার জন্য দুই দল গবেষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান গবেষণাগারে অণুজীব নিয়ে গবেষণার কাজ কৰাবেন।

প্রথম দল: অকোষীয় রোগ সৃষ্টিকাৰী অণুজীব নিয়ে কাজ কৰাবেন।
দ্বিতীয় দল: আদি কোষীয় অণুজীব নিয়ে কাজ কৰাবেন। গবেষক দলেৰ যৌথ ত্ৰিফিং জানা গেল প্রথম দলেৰ অণুজীব দলেৰ অণুজীবকে ভক্ষণ কৰে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়।

/লাবমদিবাটি সৱকাৰি কলেজ/

ক. মেরিস্টেম কালচাৰ কি?

খ. ফটোফসফোরাইলেশন বলতে কি বুঝ?

গ. প্রথম ও দ্বিতীয় গবেষকদল যে অণুজীব নিয়ে কাজ কৰাবেন, সেই অণুজীবত্বয়ের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য লিখ।

ঘ. গবেষক দলেৰ যৌথ ত্ৰিফিং এ যে বিষয়টি জানা গেল সে প্ৰক্ৰিয়াটি বিশেষণ কৰ।

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মেরিস্টেম কালচাৰ হলো চিস্যুকালচাৰ পদ্ধতিৰ একটি বিশেষ দিক যার মাধ্যমে রোগমুক্ত চাৰাগাছ উৎপাদন কৰা যায়।

খ কোনো যৌগেৰ সাথে ফসফেট সংযুক্ত প্ৰক্ৰিয়াকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন। আৱ আলোক শক্তি ব্যবহাৰ কৰে ফটোফসফোরাইলেশন। অৰ্থাৎ সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়ায় আলোক শক্তি ব্যবহাৰ কৰে ATP তৈৰি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন বলে।

ঝ উদ্দীপকেৰ প্রথম ও দ্বিতীয় গবেষকদল যথাক্রমে ভাইৱাস ও ব্যাকটেরিয়াৰ মধ্যে গঠনগত পার্থক্য নিম্নরূপ—

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. ভাইরাস অকোষীয়। এতে নিউক্লিয়াস নেই।	i. ব্যাকটেরিয়া কোষীয়। এদের আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস বিদ্যমান।
ii. এরা অতি-আণুবীক্ষণিক, এদের আকার 0.01 হতে 0.3 মাইক্রোমিটার।	ii. এর আণুবীক্ষণিক, এদের আকার 0.2 হতে 50 মাইক্রোমিটার।
iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই।	iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ থাকে।
iv. এদের নিউক্লিক এসিড ক্যাপসিড-এর মধ্যে অবস্থান করে।	iv. এদের নিউক্লিক এসিড ক্যাপসিড-এর মধ্যে অবস্থান করে না।
v. কোষে DNA বা RNA যেকোনো একপ্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	v. কোষে DNA বা RNA উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

ব) উদ্দীপকের গবেষক দলের ঘোষ ত্রিফিং থেকে জানা যায় যে, প্রথম দলের অণুজীব তথ্য ভাইরাস ছিটীয় দলের অণুজীব তথ্য ব্যাকটেরিয়াকে ভক্ষণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। মূলত T_2 ফায় ভাইরাস $E. coli$ ব্যাকটেরিয়াকে ভক্ষণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। এর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথ-

i. সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি $E. coli$ ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষপ্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বন্ত (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তর্ফেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

ii. সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় : ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, T_2 ফায় ভাইরাস সর্বদাই অন্যের সহায়তায় অর্থাৎ $E. coli$ ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় বংশবিস্তারে সক্ষম।

iii. বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষ প্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

এভাবে, T_2 ফায় ভাইরাস $E. coli$ ব্যাকটেরিয়াকে ভক্ষণ করে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়।

প্রমাণ ৪৫ জীববিজ্ঞান ক্লাসে স্যার একধরনের আণুবীক্ষণিক জীব সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, যার দেহে বংশগতীয় উপাদান ছাড়াও বৃত্তাকার DNA বিদ্যমান। এছাড়া আরেক রকমের অণুজীব আছে যারা অকোষীয় এবং অন্যান্য জীবের ক্ষতি করে থাকে।

/অ্যাপুরহাট সরকারি কলেজ/

- ক. ম্যালেরিয়া কী? ১
- খ. হেপাটিক সাইজোগনি বলতে কী বোঝ? ২
- গ. ছিটীয় অণুজীবটি প্রথম অণুজীবকে ব্যবহার করে কীভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়, ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. জীবজগতে অণুজীব দুটির উপকারী দিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ম্যালেরিয়া হলো এক ধরনের পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত জ্বর।

খ) মানুষের যকৃত কোষে ম্যালেরিয়া পরজীবীর যে অযৌন জনন সম্পর্ক হয় তাকে হেপাটিক সাইজোগনি বলে। হেপাটিক সাইজোগনি নিম্নলিখিত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যথা- প্রি-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি এবং এরো-এরিথ্রোসাইটিক হেপাটিক সাইজোগনি।

গ) উদ্দীপকের প্রথম অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া এবং ছিটীয় অণুজীবটি হলো ভাইরাস। কিন্তু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে ব্যাকটেরিয়া কোষের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করে থাকে। যেমন— T_2 ফায় ভাইরাস $E. coli$ ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে। এর সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি $E. coli$ ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষপ্রাচীর ছিদ্র হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বন্ত (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তর্ফেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়: ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ গঠন এবং নতুন ভাইরাস গঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ তৈরি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষপ্রাচীর ছিন্ন করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে মাত্র ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, T_2 ফায় ভাইরাস সর্বদাই অন্যের সহায়তায় অর্থাৎ $E. coli$ ব্যাকটেরিয়ার সহায়তায় বংশবিস্তারে সক্ষম।

ব) জীবজগতে অণুজীব দুটি অর্থাৎ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের বিভিন্ন উপকারি দিক রয়েছে। এর মধ্যে ভাইরাস দিয়ে বসন্ত, পোলিও, প্লেগ, জড়িস ও জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয়। জেনেটিক প্রকৌশলে বাহক হিসেবে এবং ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ভাইরাস ব্যবহৃত হয়। কতিপয় ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমনেও ভাইরাসের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। লাল টিউলিপ ফুলে ভাইরাস আক্রমণের ফলে বণিবেচিত্রি সৃষ্টি হয়, এর ফলে ফুলের সৌন্দর্য এবং বাজারমূল্য বৃদ্ধি পায়।

আবার বিভিন্ন ধরনের প্রতিরক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ব্যাকটেরিয়া থেকে পেয়ে থাকি। কলেরা, টাইফয়েড, যক্রা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি করা হয়। কিন্তু ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উরবতা বৃদ্ধি করে। দূধ থেকে পনির, দই, মাথান, ছানা তৈরিতেও ব্যাকটেরিয়া প্রয়োজন হয়। পাটের আঁশ ছাড়াতে ব্যাকটেরিয়ার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চা, কফি ও তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত এনজাইমের প্রয়োজন হয়।

প্রমাণ ৪৬ হাসেম গ্রীষ্মের ছুটিতে বান্দরবন বেড়াতে গেল। বাড়ি ফেরার কয়েকদিন পর তার কাপুনিসহ জ্বর শুরু হল। দুই দিন পর পর জ্বর এসে ঘাম দিয়ে জ্বর সারতো। /সরকারি বজাৰবন্দু কলেজ, গোপনগঞ্জ/

ক. মেরোজাইগোট কী? ১

খ. জীবাণুর নামসহ মানুষের ব্যাক্টেরিয়াগতিত ২টি রোগের নাম লিখ। ২

গ. রোগটির জ্বর আসার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জীবাণুটির যে চক্রটি শেষে মানবদেহে জ্বর আসে তার চিত্রসহ ব্যাখ্যা দাও। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক) ব্যাকটেরিয়ার যৌন জননের ক্ষেত্রে গ্রহিতা কোষে যে অসম্পূর্ণ জাইগোট সৃষ্টি হয় তাই মেরোজাইগোট।

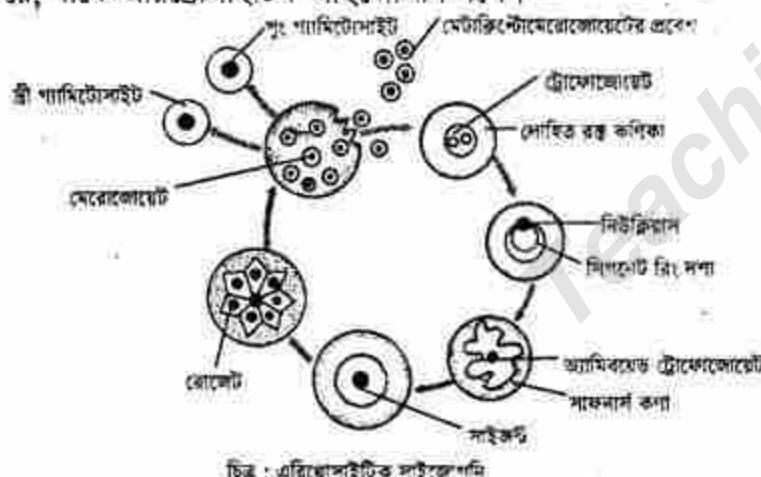
৬. জীবাণুর নামসহ মানুষের ব্যাকটেরিয়াগতিত দুটি রোগের নাম হলো—

রোগের নাম	জীবাণুর নাম
১. কলেরা	<i>Vibrio cholerae</i>
২. টাইফয়েড জ্বর	<i>Salmonella typhosa</i>

৭. হ্যাসেম ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত। ধারণা করা হতো যে পরজীবীর দেহ থেকে নিঃসৃত হিমোজেন নামক বিষাক্ত রঞ্জক পদার্থের কারণে বা কোনো বিষবস্তু ক্ষরণের ফলে মানুষের দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং জ্বর আসে। কিন্তু বর্তমান ধারণা অনুযায়ী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষের দেহের লোহিত রক্ত কণিকার প্রাচীর ভেঙে মেরোজয়েটগুলো রক্তের প্রবেশ করে। মেরোজয়েটগুলো বহিরাগত বস্তু যা রক্তের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে দেয়। এ বহিরাগত বস্তুগুলোকে ধ্বংস করার জন্য রক্তের শ্বেতকণিকা পাইরোজেন নামক এক প্রকার পদার্থ ক্ষরণ করে। শ্বেতকণিকা যখন অতিরিক্ত পাইরোজেন ক্ষরণ করে তখন মন্তিক্ষের হাইপোথ্যালামাস অংশ, বিশেষ করে তাপসংবেদী কেন্দ্রগুলো উদ্বৃত্ত হয়। তখন প্রোস্টাগ্যাডিন, মনোঅ্যামাইন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ বেড়িয়ে আসে। এ ঘৰের হাইপোথ্যালামাসের পেছন দিকটায় পৌঁছালে ভেসোমেট্রি স্লায়াত্রু উভেজিত হয়। এ উভেজনা দেহের প্রাণীয় অঞ্চলের রক্তনালিগুলোকে সংকুচিত করে ফলে দেহ থেকে অতিরিক্ত তাপ বের হতে পারে না। এ কারণেই দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। দেহের এ তাপ বৃদ্ধিকে জ্বর বলে। ঠিক এ কারণেই হ্যাসেমের শরীরে জ্বর আসে।

৮. জীবাণুটি হলো প্লাজমোডিয়াম যা ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ। প্লাজমোডিয়ামের এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনির শেষে মানবদেহে জ্বর আসে।

হেপাটিক সাইজেগনির পর ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তের লোহিত কণিকা আক্রমণ করে ও সেখানে অযৌন (সাইজেগনি) প্রক্রিয়ার বংশবৃদ্ধি করে, যাকে এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনি বলে।



চিত্র: এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনি

লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে মেটাক্রিনেটে মেরোজয়েট হিমোগ্লোবিনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আকারে বড় ও গোল হয়ে ট্রফোজয়েটে পরিণত হয়। এসময় ট্রফোজয়েটের কেন্দ্রে একটি গহ্বর উৎপন্ন হয় ও আকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে একে রিং এর মতো দেখায়। এ অবস্থাকে সিগনেট রিং দশা বলে। সিগনেট রিং আধা ঘণ্টার মধ্যে অ্যামিবার ন্যায় অনিয়মিত ক্ষণপদবুন্ত অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েটে পরিণত হয়। এ পর্যায়ে লোহিত কণিকায় দানার ন্যায় সাফল্যস কণা দেখা দেয়। কিছু সময় পর ক্ষণপদ বিলুপ্ত হয় ও জীবাণু গোলাকার সাইজেটে পরিণত হয়। এর সাইটোপ্লাজমে হিমোজয়েন নামক বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ জমা থাকে। সাইজেট লোহিত কণিকার অধিকাংশ স্থান দখল করে অবস্থান করে ও বহু বিভাজন প্রক্রিয়ায় মেরোজয়েট উৎপন্ন করে। মেরোজয়েটগুলো ফুলের পাপড়ির মতো বিন্যস্ত থাকে, যা রোজেট দশা নামে পরিচিত। রক্ত কণিকা ভেঙে মেরোজয়েট বেরিয়ে আসে ও পুনরায় নতুন লোহিত কণিকা আক্রমণ করে। প্রজাতিভেদে এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনি সমাপ্ত হতে ৪৮—৭২ ঘণ্টা সময় লাগে। লোহিত কণিকা ধ্বংস হবার কারণে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণের পর বিষাক্ত হিমোজয়েন নামক বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। লোহিত কণিকা ভেঙে মেরোজয়েট যখন বেরিয়ে আসে তখন হিমোজয়েন রক্ত রসে মিশে যায় ও কোষের উপর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। একই সাথে মেরোজয়েটগুলোকে ধ্বংস করার জন্য শ্বেতকণিকা অতিরিক্ত পাইরোজেন নামক বিষাক্ত পদার্থ ক্ষরণ করে। এর ফলে রোগীর দেহে কম্পন দিয়ে প্রচণ্ড জ্বর আসে।

প্রমুখ ৪৭ পুজুর ছুটিতে মাসুদ সিরাজগঞ্জ বেড়াতে যেয়ে ৪/৫ দিন থাকার পর আবার ঢাকায় ফিরে আসলো। তার পরপরই কঠিন এক জ্বর পড়ল, কোনোভাবেই জ্বর পড়ে না। অবশেষে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট গেলে রক্ত পরীক্ষা করার পর বললেন আপনার রক্তে এক বিশেষ জীবাণুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, তবে ভয়ের কোনো কারণ নাই কিছু নিয়ম মেনে চললে এ রোগের হাত থেকে মৃত্যু পাওয়া যাবে।

জ্যাস্টেনসেট কলেজ, কুমিল্লা।

- ক. জনুক্রম কী? ১
- খ. মস ও ফার্নের পার্থক্য কর। ২
- গ. উদ্বৃত্তকে উল্লেখিত জীবাণুটি মানবদেহের লোহিত রক্ত কণিকায় যে ধাপ অতিক্রম করে তার বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. ডাক্তার কি কি নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিলেন বলে তুমি মনে কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো জীবের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ের সঙ্গে স্পোরোফাইটিক পর্যায়ের যে পালক্রম ঘটে তাই জনুক্রম।

খ মস ও ফার্নের পার্থক্য নিম্নরূপ—

মস	ফার্ন
১. আদি প্রকৃতির স্থলজ, তবে উভচর স্বভাবের।	১. অপৃষ্পক উভিদের মধ্যে সর্বোন্নত এরাই প্রথম স্থলজ উভিদ।
২. প্রধান দেহ গ্যামেটোসাইটিক (n)।	২. প্রধান দেহ স্পোরোসাইটিক (2n)
৩. পরিবহন টিস্যু থাকে না।	৩. পরিবহন টিস্যু থাকে।

গ মাসুম ম্যালেরিয়া জ্বরে ভূগ়ছে। *Anopheles* মশকীর মাধ্যমে ম্যালেরিয়া জীবাণু *Plasmodium* মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। *Anopheles* মশকীর দংশনের মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণু স্বারা সাথী প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সাথীর যকৃত কোষ থেকে বের হওয়া জীবাণুর মেরোজয়েট দশা লোহিত রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে ভেতরে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা সিগনেট রিং, অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েট দশা পার করে বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট সাইজেট দশায় পৌঁছায়। সাইজেট বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় মেরোজয়েট উৎপন্ন করে। এ সময় কোষে বিষাক্ত হিমোজয়েন উৎপন্ন হয়। লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে মেরোজয়েটগুলো হিমোজয়েনসহ প্লাজমায় বেরিয়ে আসে এবং বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। একই সাথে মেরোজয়েটগুলোকে ধ্বংস করার জন্য শ্বেতকণিকা অতিরিক্ত পাইরোজেন নামক বিষাক্ত পদার্থ ক্ষরণ করে। আর এর ফলেই সাথীর কম্পন দিয়ে জ্বর শুরু হয়। পরবর্তীতে মেরোজয়েটগুলো পুনরায় লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে তার জীবনচক্র সম্পন্ন করতে থাকে। এ চক্রকে এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগনি বলে।

ঘ মাসুমের ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে। এ রোগের হাত থেকে মৃত্যু পেতে ডাক্তার তাকে কিছু নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিলেন। যেমন—ঘরের দরজা বা জানালায় মাশকীরোধী নেট ব্যবহার করে মশকীর দংশন হতে আস্তরক্ষা করা। এছাড়া কয়েল বা বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ব্যবহার করা বা দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ধরনের ক্রিম বা লোশন লাগানোর মাধ্যমে মশকীর দংশন হতে বাঁচা। শয়নের সময় মশারি ব্যবহার করা। সম্বৰ্যায় ধূপের ধোয়া প্রয়োগ করা যায়।

মাসুমকে অবশ্যই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করাতে হবে। রোগ শনাক্ত করা ও উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করলে ম্যালেরিয়া রোগ হতে পরিত্বাপ পাওয়া যায়। সিনকোনা গাছের বাকল হতে তৈরি কুইনাইন ম্যালেরিয়া নিরাময়ের মূল ঔষধ। এ কুইনাইন স্বারাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ তৈরি হয়েছে। যেমন— ক্লোরোকুইন, নিডাকুইন, কেমোকুইন, অ্যাভলোক্লোর, প্যালাট্রিন ইত্যাদিসহ ম্যালেরিয়া পরজীবী ঝংসের ভালো মানের বেশ কিছু ঔষধ বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়া আক্রান্ত মাসুমকে যাতে মশকী দৃশ্যন করতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, নতুন দ্রুত রোগের বিস্তার ঘটতে পারে।

দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর গবেষণার পর অবশ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে বিশের প্রথম ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক টিকা "Mosquirix" যা RTS,S নামেও পরিচিত। European Medicine Agency (EMA) ইতোমধ্যেই এ Vaccine-কে স্বীকৃতি দিয়েছে। চার ডোজের এ টিকা *Plasmodium falciparum* জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকর অ্যান্টিবিডি উৎপাদনে সক্ষম। তাই ভবিষ্যতে যেন অন্য ধরনের ম্যালেরিয়া জুরে আক্রান্ত না হয় সেজন্য মাসুম ম্যালেরিয়ার টিকা গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন ৪৮ তৃণভোজী প্রাণীর অন্তে খাদ্য হজমকারী এক ধরনের অণুজীব বাস করে। অপর একটি অণুজীব উপরোক্ত অণুজীবকে সংক্রমণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়।

/ক্লিনিকাল টিকোরিয়া সরকারি কলেজ/

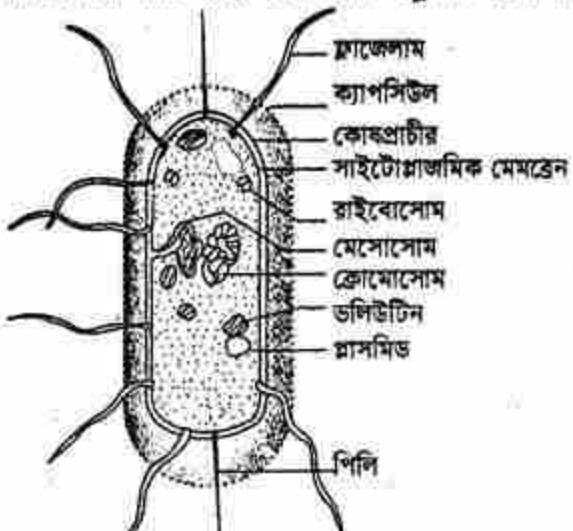
- ক. জনুক্রম কী? ১
- খ. সুক্রোজ রিডিউসিং সুগার নয় কেন? ২
- গ. প্রথমোক্ত অণুজীবটির গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষোক্ত অণুজীবটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো জীবের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়ের সাথে স্পেনোফাইটিক পর্যায়ের যে পালাত্রম ঘটে তাই জনুক্রম।

খ সুক্রোজ রিডিউসিং সুগার নয়, এটি একটি নন-রিডিউসিং সুগার। যে সকল কার্বোহাইড্রেটে কমপক্ষে ১টি মুক্ত অ্যালডিহাইড (-CHO) বা কিটোন (=CO) গ্রুপ থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজ্ঞাপিত করতে পারে তাদেরকে বিজ্ঞাপক শর্করা বা রিডিউসিং সুগার বলে। কিন্তু সুক্রোজে মুক্ত অ্যালডিহাইড (-CHO) বা কিটোন (=CO) গ্রুপ না থাকায় ক্ষারীয় আয়নকে বিজ্ঞাপিত করতে পারে না তাই একে নন-রিডিউসিং সুগার বলে।

গ তৃণভোজী প্রাণীর অন্তে খাদ্য হজমকারী অণুজীব হলো ব্যাকটেরিয়া।



চিত্র: একটি আদর্শ ব্যাকটেরিয়াম কোষ

প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ঘিরে একটি জড় কোষপ্রাচীর থাকে। এর প্রধান উপাদান পেপটিভোগ্লাইকান। বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষ প্রাচীরকে ঘিরে জটিল কর্বোহাইড্রেট দিয়ে বা পলিপেপ্টাইড দিয়ে গঠিত একটি পুরু স্তর থাকে, যাকে ক্যাপসিউল বলে। অনেক ব্যাকটেরিয়াতে একটি ফ্ল্যাজেলাম বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। ফ্ল্যাজেলা ছাড়াও কোনো ব্যাকটেরিয়াতে খাটো ও শক্ত পিলি থাকে। সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টন করে

সজীব প্লাজমামেম্ব্রেন অবস্থিত। ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেম্ব্রেন কখনো কখনো ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে মেসোজোম গঠন করে। সাইটোপ্লাজমিক মেম্ব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বর্ণহীন, বৃক্ষ। এতে বিদ্যমান থাকে ছেট ছেট কোষ গহ্বর, চর্বি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন, থানিজ পদার্থ। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য অজ্ঞান হলো মুক্ত রাইবোসোম এবং পলিরাইবোসোম। কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র একটি ক্লোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্লোমোসোম ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকার ও বৃত্তাকার ক্লোমোসোম থাকে, যাকে প্লাসমিড বলে।

ব উদ্দীপকের শেষোক্ত অণুজীবটি হলো ভাইরাস। মানবকুলের জন্য ভাইরাস যত না উপকারী তার চেয়ে বেশি অপকারী। ভাইরাস আক্রমণের ফলে মানুষের অন্ধকৃত, পজুত, এমনকি অকাল মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। নিম্নে ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সমন্বে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

ভাইরাসের অপকারিতা : ভাইরাস উত্তিদ, প্রাণী ও মানবকুলের অনেক ক্ষতি করে থাকে। যেমন :

১. ভাইরাস মানুষের বসন্ত, হাম, পোলিও, জলাতঙ্ক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হার্পিস, ডেজু, ভাইরাল হেপাটাইটিস প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে।
২. বিভিন্ন উত্তিদের যেমন- শিমের মোজাইক রোগ, আলুর লিফরোল (পাতা কুঁচকাইয়া যাওয়া), পেপের লিফকার্ল, ক্লোরেসিস, ধানের টুঁরো রোগসহ প্রায় ৩০০ উত্তিদ রোগ ভাইরাস দ্বারা ঘটে থাকে। এতে ফসলের উৎপাদন বিপুলভাবে হ্রাস পায়।
৩. গরুর বসন্ত, গরু, ডেজা, ছাগল, শুকর, মহিষ ইত্যাদি প্রাণীর 'ফুট এ্যান্ড মাউথ' রোগ অর্থাৎ এদের পা ও মুখের বিশেষ ক্ষতরোগ (খুরারোগ) এবং মানুষ, কুকুর ও বিড়ালের দেহে জলাতঙ্ক রোগ ভাইরাস দিয়েই সৃষ্টি হয়।
৪. ফায় ভাইরাস মানুষের কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়াকেও খৎস করে থাকে।
৫. বহুল আলোচিত 'এইডস' রোগের কারণ হিসেবেও বিজ্ঞানীগণ ভাইরাসকে দায়ী করেছেন। HIV দিয়ে AIDS রোগ হয়। HIV দিয়ে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। এর ফলে অকাল মৃত্যু অবধারিত। বাংলাদেশে ক্রমেই এইডস রোগীর সংখ্যা এবং এ রোগে মৃত্যুর সংখ্যা বাঢ়ছে। বর্তমান বিশেষ AIDS রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি।

এছাড়া ইবোলা, জিকা, নিপা, SARS, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, হেপাটাইটিস, সার্দিজ্জুর, বিভিন্ন ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে।

ভাইরাসের উপকারিতা : বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে ভাইরাসকে বিভিন্নভাবে মানুষের কিছু উপকারে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন -

১. বসন্ত, পোলিও, প্লেগ এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা ভাইরাস দিয়েই তৈরি করা হয়।
২. ভাইরাস হতে 'জভিস' রোগের টিকা তৈরি করা যায়।
৩. কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি রোগের ঔষধ তৈরিতে ব্যাকটেরিওফায় ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।
৪. ভাইরাসকে বর্তমানে বহুল আলোচিত 'জেনেটিক প্রকোশল'-এ বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
৫. ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে ভাইরাস ব্যবহার করা হয়।
৬. কতিপয় ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমনেও ভাইরাসের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। যুক্তরাষ্ট্রে NPV কে কীট পতঙ্গনাশক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।
৭. ফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে খৎস করে ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে থাকে।
৮. লাল টিউলিপ ফুলে ভাইরাস আক্রমণের ফলে লম্বা লম্বা সাদা সাদা দাগ পড়ে, এর ফলে ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং ফুলের মূল্য বেড়ে যায়।

৯. অন্টেলিয়ার খরগোসের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ফসলের চরম ক্ষতি হচ্ছে। Myxovirus-এর সাহায্যে খরগোশ নির্ধন করে তাদের সংখ্যা কমানো হয়েছে।

পৃষ্ঠা ▶ ৪৯



A-অণুজীব

জ্ঞান চি. ও ম্যার: স্কুল এক কলেজ, বগুড়া।

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ক. নিউক্লিক অ্যাসিড কী? | ১ |
| খ. ভাইরাস জড় না জীব? ব্যাখ্যা কর। | ২ |
| গ. A-অণুজীবটির গঠন বর্ণনা কর। | ৩ |
| ঘ. A-অণুজীবটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অসংখ্য নিউক্লিওটাইড পলিমার সৃষ্টির মাধ্যমে যে অ্যাসিড তৈরি করে তাই হলো নিউক্লিক অ্যাসিড।

খ ভাইরাস হলো অতি আণুবীক্ষণিক, অকোষীয় এক প্রকার সত্ত্ব। ভাইরাস সজীব কোষের অভ্যন্তরে বৎসর্বৃদ্ধি করে এবং পরিব্যক্তি ও অভিব্যক্তি দেখা যায়। আবার সজীব কোষের বাইরে জড় বস্তুর ন্যায় আচরণ করে। অর্থাৎ কোষের বাইরে ভাইরাসের কোন জৈবিক কার্যকলাপ ঘটে না। ভাইরাস জড় ও জীব উভয়ের ন্যায় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। তাই ভাইরাসকে জড় ও জীবের সংযোগসূত্রও বলা হয়।

গ উদ্বীপকের চিত্র A হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াম। প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষকে ঘিরে একটি জড় কোষপ্রাচীর থাকে। এর প্রধান উপাদান পেপটিডোগ্লাইকান। বহু ব্যাকটেরিয়াতে কোষপ্রাচীরকে ঘিরে জাটিল কর্বাহাইড্রেট দিয়ে বা পলিপেপটাইড দিয়ে গঠিত একটি পুরু স্তর থাকে, যাকে ক্যাপসিউল বলে। অনেক ব্যাকটেরিয়াতে একটি ফ্ল্যাজেলাম বা একাধিক ফ্ল্যাজেলা থাকে। ফ্ল্যাজেলা ছাড়াও কোনো ব্যাকটেরিয়াতে খাটো ও শক্ত পিলি থাকে। সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টন করে সজীব প্লাজমামেম্ব্রেন অবস্থিত। ব্যাকটেরিয়া কোষের প্লাজমামেম্ব্রেন কখনো কখনো ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে মেসোজোম গঠন করে। সাইটোপ্লাজমিক মেম্ব্রেন দিয়ে পরিবেষ্টিত অবস্থায় সাইটোপ্লাজম অবস্থিত। সাইটোপ্লাজম বর্ণহীন, স্বচ্ছ। এতে বিদ্যমান থাকে ছোট ছোট কোষ গহ্র, চর্বি, শর্করা জাতীয় খাদ্য, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য অঙ্গাণ হলো মৃত রাইবোসোম এবং পলিরাইবোসোম। কোমে সুগঠিত নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র একটি ক্রোমোসোম থাকে, যা সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত। বহু ব্যাকটেরিয়াতে বৃহৎ ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকার ও বৃত্তাকার ক্রোমোসোম থাকে, যাকে প্লাসমিড বলা হয়।

ঘ চিত্র A এর অণুজীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাগৱক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকা যেমন- কলেরা, যজ্ঞা, টাইফয়েড, ডি.পি.টি ইত্যাদি রোগের টিকা ব্যাকটেরিয়া হতে প্রস্তুত করা হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া মাটির জৈব পদার্থ সঞ্চয় করে উর্বরতা বৃদ্ধি করে। নানাবিধি আবর্জনা পচানোর মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া জৈব সার প্রস্তুত করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া মাটিতে নাইট্রোজেন স্থাপন করে আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলের নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া ফসলের ফলন বৃদ্ধিতেও ব্যবহৃত হয়।

শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার ব্যাপক। চা, কফি, তামাক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণে, দুগ্ধজাত শিরে, পাট শিরে, চামড়া তৈরি, ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি, অ্যাসিটেইন তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়।

মানুষের অঙ্গের E. coli ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ডিটামিন-বি, ডিটামিন-কে, ডিটামিন-বি₂, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন প্রভৃতি পদার্থ প্রস্তুত ও সরবরাহ করে থাকে। জিন প্রকৌশলেও ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও আবর্জনা পচনে, পয়ঃনিষ্কাশনে, পানিতে ভাসমান তেল অপসারণেও ব্যাকটেরিয়ার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রেই ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা অনন্বীক্ষ্য।

প্রশ্ন ▶ ৫০ পথিবীতে এমন অসংখ্য জীব আছে যাদের আমার খালি চোখে দেখতে পাইনা। এদের দেখার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র প্রয়োজন হয়। তাই এরা অণুজীব নামে পরিচিত। এসকল অণুজীবের মধ্যে কিছু আছে যারা জীবকোষ ব্যতীত সংখ্যাবৃদ্ধিতে অক্ষম। আবার কিছু জীবকে আমরা জীব প্রযুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছি যারা অন্য সজীব কোষ ব্যতীত বৎসর্বৃদ্ধির সক্ষম।

(রাজেন্দ্রপুর ক্যাল্টচারেল পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর)

ক. প্রোটোপ্লাজমের চলন কী নামে পরিচিত? ১

খ. মায়োসিস কেন হয়? ২

গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত প্রথম জীবটির গঠন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্বীপকের শেষোক্ত জীবটির ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের যৌন জনন সম্পন্ন হয়-উত্তির সত্যতা যাচাই পূর্বক তোমার মতামত দাও। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রোটোপ্লাজমের চলন সাইক্লোসিস বা আবর্তন নামে পরিচিত।

খ যৌন জননশীল সকল জীবে হ্যাপ্লয়েড (n) পুংগ্যামিট এবং স্ত্রীগ্যামিটের মিলনের মাধ্যমে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট গঠিত হয়। এ জাইগোট সাধারণত মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ বহুকোষী জীবদেহ গঠন করে। জীবদেহ থেকে গ্যামিট সৃষ্টির প্রাঞ্জালে যদি ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্ধেকে না নেমে যেতো তাহলে এমন ২টি ডিপ্লয়েড গ্যামিটের মিলনে হিতীয় প্রজন্মে টেট্রাপ্লয়েড (4n) জাইগোট সৃষ্টি হতো। এভাবে প্রতি প্রজন্মে জাইগোটে ক্রোমোসোমের সংখ্যা দ্বিগুণ, চারগুণ এভাবে বাড়তে থাকতো। প্রতি প্রজন্মের জীবের বৈশিষ্ট্যে ব্যাপক তারতম্য সংঘটিত হতো। মায়োসিসের মাধ্যমে জনুক্রম হয় বলেই সকল প্রজন্মের মধ্যে ক্রোমোসোম সংখ্যা ধ্রুব থাকে এবং বৎসর্বৃদ্ধি বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে।

গ উদ্বীপকে উল্লিখিত প্রথম জীবটি হলো ভাইরাস। ভাইরাস জীবকোষ ব্যতীত সংখ্যাবৃদ্ধিতে অক্ষম। ভাইরাসের গঠন বৈশিষ্ট্যকে ভৌত ও রাসায়নিক গঠন হিসেবে ভাগ করা যেতে পারে।

ভাইরাসের ভৌত গঠন : ভাইরাসের ভৌত গঠন নিম্নরূপ :

১. কেন্দ্রে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বস্তু তথা নিউক্লিক এসিড যা DNA অথবা RNA দিয়ে গঠিত।

২. কেন্দ্রীয় বস্তুকে ঘিরে অবস্থিত ক্যাপসিড তথা প্রোটিন আবরণ। ক্যাপসিডের প্রোটিন অণু সজিত হয়ে দণ্ডাকৃতির হেলিক্স এবং গোলাকৃতির পলিহেলিন কাঠামো গঠন করে। ক্যাপসিড কতগুলো সাবইউনিট নিয়ে গঠিত। সাবইউনিটকে বলা হয় ক্যাপসোমিয়ার (capsomere)। ক্যাপসোমিয়ারের সংখ্যা ও ধরণ বিভিন্ন প্রকার ভাইরাসে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ক্যাপসিডের বহিস্থ আবরণ মসৃণ, কখনো কন্টকিতও হতে পারে।

৩. কোনো কোনো ভাইরাসে ক্যাপসিডের বাইরে ক্যাপসিডকে ঘিরে অপর একটি আবরণ থাকে।

ভাইরাসের রাসায়নিক গঠন : রাসায়নিকভাবে ভাইরাস প্রধানত দুই প্রকার বস্তু দিয়ে গঠিত। যথা- নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) এবং প্রোটিন (ক্যাপসিড)।

১. নিউক্লিক অ্যাসিড (কেন্দ্রীয় বস্তু) : ভাইরাসের কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিক অ্যাসিড। নির্দিষ্ট ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড DNA অথবা RNA এর যে কোনো এক ধরনের হয়। কখনো একই সাথে DNA এবং RNA অবস্থান করে না। অন্যান্য জীবদেহে একই সাথে DNA এবং RNA অবস্থান করে।

২. প্রোটিন (ক্যাপসিড) : প্রোটিন অণু দিয়ে ক্যাপসিড গঠিত। ক্যাপসিড সাধারণত জৈবিক দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয়। ক্যাপসিডের প্রধান কাজ হলো নিউক্লিক অ্যাসিডকে রক্ষা করা, তবে এরা পোষক দেহে সংক্রমণেও সহায়তা করে। এটি আণ্টিজেন হিসেবেও কাজ করে।

ঘ উদ্দীপকের শেষোন্ত জীবটি হলো ব্যাকটেরিয়া। সাধারণত ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে যৌন জনন না ঘটলেও *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে যৌন প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে বিপরীত যৌনধৰ্মী (+, -) দুটি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আকর্ষণের ফলে বংশগতীয় বস্তু স্থানান্তর হয়।

এটি কনজুগেশন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় দুটি ব্যাকটেরিয়া কোষ (একটি দাতা কোষ (+) এবং একটি গ্রহীতা কোষ (-)) একত্রে এসে পাশাপাশি অবস্থান করে। পরে দুটি পাশাপাশি অবস্থিত কোষের মিলিত প্রাচীরের একস্থানে কোষপ্রাচীর বিগলিত হয়ে একটি সংযোগ নালী সৃষ্টি করে। এই কনজুগেশন নালীপথে দাতাকোষের ক্রোমোজোম গ্রহীতাকোষে প্রবেশ করতে থাকে কিন্তু ক্রোমোসোমের আংশিক প্রবেশ করার পরই ব্যাকটেরিয়া দুটির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ব্যাকটেরিয়ার যৌন জননে গ্রহীতাকোষ দাতাকোষের আংশিক ক্রোমোসোম নিয়ে যে জাইগেট তৈরি করে তাকে মেরোজাইগেট বলে। মেরোজাইগেট বিভাজনের মাধ্যমে পুনরায় সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। এ প্রক্রিয়ায় কোনো সংখ্যাবৃদ্ধি হয় না, বরং দাতা কোষ আংশিক ক্রোমোসোম হারিয়ে অঠিরেই নষ্ট হয়ে যায়, ফলে প্রথমে সংখ্যাবৃদ্ধির পরিবর্তে সংখ্যা হ্রাস পায়। কাজেই এই প্রক্রিয়াকে জনন প্রক্রিয়া না বলে রিকলিনেশন প্রক্রিয়া বলাই উত্তম।

যেহেতু এ পদ্ধতি স্বাভাবিক যৌন জননের মত নয় তাই একে বিশেষ ধরনের যৌন জনন বলা যায়। আবার আমরা সক্ষ করলে বুঝতে পারি যে, এখানে কোনো গ্যামিট সৃষ্টি হয় না, কোনো মায়োসিস বিভাজন হয় না। কোনো ডিপ্লয়েড কোষ তৈরি হয় না, কোনো জাইগেটও তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে না। তাই প্রকৃতপক্ষে ব্যাকটেরিয়ার যৌন জনন ঘটে না।

এন্ডেক্স ১১ উচ্চতর গবেষণার জন্য দুই দল গবেষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণাগারে অণুজীব নিয়ে গবেষণার কাজ করছেন।

প্রথম দল: অকোষীয় রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব নিয়ে কাজ করছেন।

দ্বিতীয় দল: আদি কোষীয় অণুজীব নিয়ে কাজ করছেন। গবেষক দলের যৌথ বিক্রিং জানা গেল প্রথম দলের অণুজীব দ্বিতীয় দলের অণুজীবকে তক্ষণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়।

//নিউ গড় জিনী কলেজ, রাজশাহী//

- ক. মেরিস্টেম কালচার কি? ১
- খ. ফটোফসফোরাইলেশন বলতে কী বুঝ? ২
- গ. প্রথম ও দ্বিতীয় গবেষক দল যে অণুজীব নিয়ে কাজ করছেন, সেই অণুজীববিহুর মধ্যে গঠনগত পার্থক্য লিখ। ৩
- ঘ. গবেষক দলের যৌথ বিক্রিং এ যে বিষয়টি জানা গেল সে প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মেরিস্টেম কালচার হলো টিস্যু কালচারের একটি বিশেষ দিক, এক্ষেত্রে উত্তিদের শীর্ষমুক্তের অগ্রভাগের টিস্যুকে কালচার করা হয়।

খ. কোনো যৌগের সাথে ফসফেট সংযুক্তি প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফসফোরাইলেশন। আবার আলোক শক্তি ব্যবহার করে ফসফোরাইলেশন ঘটানোকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন। অর্থাৎ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন।

গ. প্রথম ও দ্বিতীয় গবেষক দল যে অণুজীব নিয়ে কাজ করেছেন সেগুলো হলো যথাক্রমে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া। নিচে এদের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য দেয়া হলো —

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
i. এরা অকোষীয় এবং এতে নিউক্লিয়াস নেই।	i. এরা কোষীয় এবং এতে আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে।
ii. এরা সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।	ii. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
iii. এতে সাইটোপ্লাজম বা অন্য কোনো ক্ষুদ্রাঙ্গ নেই।	iii. এতে সাইটোপ্লাজম ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ আছে।
iv. এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না।	iv. এদের দেহকোষে এনজাইম থাকে।
v. ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে।	v. ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিক অ্যাসিড ক্যাপসিড এর মধ্যে অবস্থান করে না।
vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।	vi. এদের মধ্যে DNA বা RNA যেকোনো উভয় প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে।

ঘ প্রথম দলের গবেষকের ব্যবহৃত অণুজীবটি অর্থাৎ ভাইরাস দ্বিতীয় দলের অণুজীব অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া ভক্ষণ করে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। এসব ভাইরাস ব্যাকটেরিওফায নামে পরিচিত। যেমন- *E. coli* ফায ভাইরাস *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। এদের বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় —

সংক্রমণ পর্যায় : ব্যাকটেরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসা হতে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ পর্যন্ত এ পর্যায়ের বিস্তৃতি। স্পর্শক তন্তুর সাহায্যে এটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামের গায়ে লেগে যায়। লেগে থাকা স্থানের কোষপ্রাচীর ছিন্দ হয়ে যায় এবং ভাইরাস শুধুমাত্র তার জেনেটিক বস্তু (DNA) ব্যাকটেরিয়াম কোষে অন্তঃক্ষেপ দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেয়।

সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় : ভাইরাস DNA ও প্রোটিন আবরণ পঠন এবং নতুন ভাইরাস পঠন পর্যন্ত এ পর্যায়ে বিস্তৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাইরাস DNA ব্যাকটেরিয়ামের এনজাইমকে সংগঠিত করে অনেক নতুন ভাইরাস DNA এবং সেই সাথে প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে। শেষ পর্যায়ে DNA ও প্রোটিন আবরণ মিলে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে।

বিগলন পর্যায় : ব্যাকটেরিয়ামের কোষপ্রাচীর ছিন্দ করে নতুন ভাইরাসগুলোর বের হয়ে আসাকে বিগলন পর্যায় বলে।

এভাবে শাত্রু ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে ৩০০ নতুন ভাইরাস সৃষ্টি হতে পারে।

প্রশ্ন ১২ ভবেশ বোস জুরে আক্রান্ত, তার রক্তের বায়োক্যামিক্যাল পরীক্ষায় হিমোজোয়াইন পাওয়া গেল এবং রক্তে লোহিত কণিকার পরিমাণ ব্রাভিবিকের তুলনায় অনেক কম। //নিউ গড় জিনী কলেজ, রাজশাহী//

- ক. মনোস্যাকারাইড কী? ১
- খ. কোষচক্র বলতে কী বুঝ? ২
- গ. ভবেশ বোসের রক্তে হিমোজোয়াইন যে দশায় আসে দে দশাটির বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. ভবেশ বোসের রক্তে লোহিত কণিকার স্থলতার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে আর কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না সেগুলোই মনোস্যাকারাইড।

খ. কোষ সৃষ্টি, এর বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে বিভাজন এ তিনটি কাজ যে চক্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে কোষচক্র বলে। কোষচক্র ইন্টারফেজ

এবং মাইটোটিক ফেজ নিয়ে গঠিত। ইন্টারফেজ হলো কোষ বিভাজন শুরু করার প্রস্তুতি পর্ব। আর মাইটোটিক ফেজে প্রোফেজ, প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজ ধাপগুলো ঘটে থাকে।

গ ভবেশ বোস ম্যালেরিয়া জুরে আক্রান্ত। ম্যালেরিয়া জুরে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে হিমোজোয়াইন দেখা দেয় সাইজন্ট দশায়। একেতে ম্যালেরিয়া জীবাণুর ক্ষণপদ বিলুপ্ত হয়ে জীবাণুটি গোলাকার হয়ে যায় এবং এর নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে ১২-১৪টি নিউক্লিয়াস গঠন করে। এ দশাকে বলা হয় সাইজন্ট। এ সময় জীবাণুর সাইটোপ্লাজমে হিমোজয়েন নামক বর্জ্য পদার্থ জমা হয়। সাইজন্টের নিউক্লিয়াসগুলো সাইটোপ্লাজম দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার সময় গোলাপের পাপড়ির মতো দৃঢ়ি স্তরে বিন্দুষ্ট হয়। এ অবস্থা রোজেট দশা নামে পরিচিত।

ঘ ভবেশ বোস ম্যালেরিয়া জুরে আক্রান্ত হওয়ায় তার রক্তে লোহিত কণিকার স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। নিম্নোক্ত কারণে ম্যালেরিয়া জুরে আক্রান্ত রোগীর দেহে লোহিত কণিকার স্বল্পতা দেখা দেয় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা—

১. প্রতিটি লোহিত রক্তকণিকার ভেতর থেকে যথন গড়ে ১২-১৮টি মেরোজয়েট বেরিয়ে আসে তখন কণিকাগুলো ভাঙ্গে এবং বিনষ্ট হয়।
২. নতুন প্রতিটি মেরোজয়েট আবার একেকটি নতুন লোহিত কণিকার ভেতরে চুকে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে। এভাবে লোহিত কণিকা ধ্বংসের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।
৩. তাদের শরীরে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা দুর্বল তাদের ক্ষেত্রে অনাক্রান্ত লোহিত কণিকাও ভেঙ্গে যায়।
৪. ম্যালেরিয়ার তীব্র আক্রমণের সময় মজ্জার কাজে বাধা পড়ে, ফলে লোহিত কণিকা তৈরিতে বিশুর্জলা দেখা দেয় (যতটা লোহ দরকার ততটা পায় না বলে মজ্জার লোহিত কণিকা সৃষ্টির ক্ষমতা কমে যায়)।
৫. প্লীহা অনেক বড় হয়ে যায়, ফলে সেখানে প্রচুর রক্ত জমা হয়, কোথাওকা রক্তপাত হয় এবং রক্তের দলা জমে বা জুড়ে যায়। এ কারণে রক্তব্লস্তা হয়।

ভবেশ বোসের শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণু আক্রমণে উপরের ঘটনাগুলো ঘটায় তার রক্তে লোহিত কণিকার স্বল্পতা দেখা দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৫৩ মানিকের পাতলা পায়খানা আরম্ভ হয়েছে; অনেকটা চাল ধোয়া পানির মত। কোন ব্যাথা নেই তবে মলের সাথে রক্তও দেখা যায়। বমি বমি ভাব এবং মাঝে মাঝে কম পরিমাণে বমি হতে থাকে। দেহে পানি শূন্যতা দেখা দিয়েছে। মাংসপেশিও মাঝে মাঝে সংকুচিত হয়। চোখ কোটিগত ও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তীব্র পানি পিপাসা। এত পানি-শূন্যতায় দেহে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

/মুরারিচান্দ কলেজ, সিলেট/

- ক. প্লাজমিড কী? ১
- খ. এডেন্সের বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্বীপকে উল্লেখিত ব্যাধিতে মানিকের ব্যাধি কি কি ভাবে ছড়াতে পারে উল্লেখ কর। ৩
- ঘ. মানিক এই ব্যাধির বিরুদ্ধে কী কী প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজে সুস্থ থাকতে পারে এ-ব্যাপারে তোমার সুস্পষ্ট মতামত দাও। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাকটেরিয়ার কোষে ক্রোমোসোম বহির্ভূত গোলাকার স্তুতি DNAই হলো প্লাজমিড।

খ প্রতিকূল পরিবেশে খাদ্যের অভাব ঘটলে কিছু ব্যাকটেরিয়ার কোষের চারদিকে পুরু আবরণ সৃষ্টি হয়। এই আবরণের ভেতরে প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত অবস্থায় থাকে। একেই এডেন্সের বলে। এডেন্সের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার অযৌন জনন ঘটে।

গ উদ্বীপকে উল্লেখিত মানিকের রোগের লক্ষণ থেকে বোঝা যায় তার কলেরা হয়েছে। কলেরা রোগ যেভাবে ছড়াতে পারে তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

Vibrio cholerae নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ ছড়ায়। এটি একটি পানিবাহিত রোগ। সুস্থ লোকের পেটে জীবাণু না যাওয়া পর্যন্ত এ রোগ হয় না। সুস্থ লোক আক্রান্ত লোকের মলের উপর দিয়ে হেটে গেলে বা আক্রান্ত রোগীর মল বা বমি শরীরে মেখে গেলেও এ রোগ হয় না। মল হারা দূষিত পানি এবং খোলা ও বাসি খাবার রোগীর পেটে চুকে রোগের সংক্রমণ ঘটায়। মাছি হারা রোগীর মল ও বমি, খাদ্যকে দূষিত করে। আর সেই দূষিত খাবার গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে বা ছড়িয়ে যায়।

ঘ উদ্বীপকে উল্লেখিত মানিক এই ব্যাধির বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সুস্থ থাকতে পারে, সে ব্যাপারে নিচে আমার সুস্পষ্ট মতামত তুলে ধরলাম—

প্রতিকার :

- i. যথাসংষ্কৰ দুত চিকিৎসা শুরু করতে হবে। পানিশূন্যতা রোধে প্রথমেই খাবার স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। তৈরি স্যালাইন সহজলভ্য না, হলে ফুটানো পানি, লবণ ও গুড় দিয়ে সহজেই বাড়িতে স্যালাইন তৈরি করতে হবে।
- ii. রোগী মুখে স্যালাইন গ্রহণ করতে না পারলে শিরার মাধ্যমে স্যালাইন অর্থাৎ শিরায় আইডি ফুইড (ইন্ট্রাভেনাস ফুইড) দিতে হবে।
- iii. রোগের সংক্রমণ গুরুতর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টেট্রাসাইক্লিন, এরিথ্রোমাইসিন বা সিপ্রোক্লিসিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে।

প্রতিরোধ :

- i. কলেরা একটি পানিবাহিত রোগ। কাজেই বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে এ রোগ অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যায়।
- ii. খোলা ও বাসি খাবার এবং পানীয় বর্জন করতে হবে।
- iii. শাকসবজি ও ফল-মূল ভালো করে ধূয়ে খেতে হবে।
- iv. খাবার গ্রহণ করার আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধূতে হবে।
- v. রোগীর মলমৃদ্দ ও বমিযুক্ত কাপড়-চোপড় পুরুর বা খালে-বিলে না ধূয়ে সিন্ধ করে রোদে শুকিয়ে ফেলতে হবে।
- vi. যথাসময়ে কলেরা রোগের টিকা গ্রহণ করলে এ রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৫৪ মীনার যকৃত বড় হয়ে গেছে; জড়িস হওয়ায় দেহত্বক, মুখ, চোখ হয়ে গেছে হলুদ বর্ণের। রক্তে বেড়ে গেছে বিলিরূপের মাত্রা। খাওয়া অরুচি, জ্বরও দেখা দিয়েছে।

/মুরারিচান্দ কলেজ, সিলেট/

- ক. ক্যাপসিড কী? ১
- খ. লাইটিক ও লাসোজেনিক চক্র বলতে কী বুঝ? ২
- গ. উদ্বীপকে বণিত রোগের ক্ষেত্রে দায়ী জীবাণু কীভাবে বিস্তার লাভ করে? ৩
- ঘ. 'প্রতিকারই প্রতিরোধ' উক্তিটি এই রোগের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাইরাসের প্রোটিন আবরণই ক্যাপসিড।

খ যে প্রক্রিয়ায় ফায় ভাইরাস পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্ক করে এবং অপত্য ভাইরাসগুরো পোষক দেহের বিদারণ ঘটিয়ে নির্গত হয় তখন তাকে লাইটিক চক্র বলে। অপরদিকে যে প্রক্রিয়ায় ফায় ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রবেশের পর ভাইরাল DNAটি ব্যাকটেরিয়াল DNA অণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রতিলিপি গঠন করে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসরূপে ব্যাকটেরিয়া কোষের বিদারণ ঘটে না তাকে লাইসোজেনিক চক্র বলে।

ঘ উদ্বীপক অনুসারে, মীনার যকৃত বড় হয়ে গিয়েছে। জড়িস হওয়ায় দেহত্বক, চোখ, মুখ হলুদ হয়ে গিয়েছে। সূতরাং, মীনা ভাইরাল হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত। হেপাটাইটিস রোগের কারণ

হেপটাইটিস-**B** ভাইরাস, এছাড়া হেপটাইটিস-**A** ভাইরাস (HAV), হেপটাইটিস-**C** ভাইরাস (HCV) ও হেপটাইটিস-**D** ভাইরাস (HDV) ও হেপটাইটিস-**E** ভাইরাস (HEV) দিয়েও লিভার প্রদাহ হয়ে থাকে। নিচে হেপটাইটিস ভাইরাসের বিস্তার প্রক্রিয়া দেয়া হলো—

১. আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধপানের মাধ্যমে শিশু আক্রান্ত হতে পারে।
২. আক্রান্ত ব্যক্তির ইনজেকশনের সিরিজের মাধ্যমে সৃষ্টি ব্যক্তির দেহে এ ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে।
৩. অনিরাপদ যৌন মিলনের মাধ্যমেও এ ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে এছাড়া শাইটোমেগালো ভাইরাস, এপিস্টেল বার ভাইরাস। হারপেস জোন্টার ভাইরাস কোনো কোনো সময় শিশুর হেপটাইটিস সৃষ্টি করে।

৫ উদ্ধীপকে, মীনা হেপটাইটিস রোগে আক্রান্ত। এক্ষেত্রে প্রতিকারই যে প্রতিরোধ তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

অধিকাংশ হেপটাইটিস রোগীর হেপটাইটিস-এ, হেপটাইটিস-ই হসপিটালে ভর্তির প্রয়োজন পড়ে না। হেপটাইটিস আক্রান্ত রোগীর প্রচুর বিশ্রাম ও ঘুরুজ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ প্রয়োজন। মাতৃদেহ থেকে সন্তানে যাতে ভাইরাস প্রবেশ না করতে পারে এজন্য গর্ভবতী মায়েদের টিকা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। হেপটাইটিস-বি ও সি দ্বারা আক্রান্ত রোগীর প্রবর্তীতে লিভার ক্যান্সার ও লিভার সেরোসিস হতে পারে বলে সূচিকৃত্বা অত্যন্ত জরুরি। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো ঔষধ এখনও আবিষ্কার হয়নি। অ্যান্টিভাইরাস গুরুত্ব পেগাসিস এবং রিবাভাইরিন বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় ও বাজারে সহজ প্রাপ্য। তবে হেপটাইটিস-বি এর জন্য প্রতিরোধী টিকা আবিষ্কার হয়েছে।

হেপটাইটিস রোগীর জন্য সহজপাচ্য খাবার অল্প অল্প করে বার বার দিতে হবে। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার, মাদক ও তন্ত্রাদায়ক ওষুধ অবশ্য বর্জনীয়। রোগীকে ঘন ঘন পানি পান করতে হবে এবং পরিমিত বিশ্রামসহ শারীরিক পরিশ্রম পরিহার করতে হবে।

শুধু স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করেই অধিকাংশ ভাইরাস দ্বারা যুক্তের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, প্রয়োজনে পানি ভালোভাবে ফুটিয়ে পান করা প্রয়োজন। পায়খানার পর, শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তনের সময়, রান্নার আগে ভালোভাবে হাত সাবান বা জীবাণুনাশক দিয়ে ধোয়ার ব্যবস্থা নিলে এ ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ হয়। সিরিজ ও অন্যান্য মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি এবং রক্ত নেওয়ার আগে পরীক্ষা করে নিতে হবে। যেকোনো বয়সের লোক হেপটাইটিস-বি ভাইরাসের টিকা গ্রহণ করে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

প্রশ্ন **৫৫** *Plasmodium* গণভুক্ত অস্তিত্ব: ৬০টি প্রজাতি মানুষসহ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এক ধরণের মারাত্মক ঝুর-রোগ সৃষ্টি করে। এ রোগে সোহিত রক্ত কণিকা ও যুক্ত কোষ ধ্বংস হয়।

- ক. ডেক্টর কী? ১
- খ. কেবল অ্যানোফিলিস মশকী ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় কেন? ২
- গ. উদ্ধীপকে উল্লিখিত জীবাণুটি যুক্তে কিভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ঠিক? ৩
- ঘ. অ্যানোফিলিস মশকীই পরজীবীটির প্রাথমিক পোষক-ব্যাখ্যা কর। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রোগজীবাণুর বাহকই হলো ডেক্টর।

খ ম্যালেরিয়া রোগ *Plasmodium* গণের এককোষী প্রোটোজোয়া দ্বারা হয়। এ পরজীবী শুধুমাত্র মানুষ ও অ্যানোফিলিস জাতীয় মশকীর দেহে জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে। অ্যানোফিলিস মশকী যখন কোনো ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষকে দংশন করে তখন প্রাজমোডিয়াম মানুষের রক্ত থেকে মশকীর দেহে প্রবেশ করে এবং নিখেক সম্পন্ন করে। প্রবর্তীতে উক্ত অ্যানোফিলিস মশকী কোনো সৃষ্টি ব্যক্তিকে দংশন করলে *Plasmodium*-এর স্পোরোজোয়েট মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। তাই কেবল অ্যানোফিলিস মশকীই ম্যালেরিয়া ছড়ায়।

গ উদ্ধীপকে উল্লিখিত রোগটি হলো ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুর নাম *Plasmodium vivax*। এ পরজীবীটি মানবদেহের যুক্তে হেপটাইটিস সাইজোগনি সম্পন্ন করে। মানবদেহে ম্যালেরিয়া জীবাণুর স্পোরোজোয়েট প্রবেশের পর প্রথম এক সপ্তাহে প্রিএরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি পর্যায়ের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এতে স্পোরোজোয়েট, ক্রিস্টোজোয়েট, সাইজন্ট ও ক্রিস্টোমেরোজোয়েট এ ধাপগুলো দেখা যায়।

স্পোরোজোয়েটগুলো রক্তস্তর থেকে যুক্ত কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং এখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যুক্ত কোষ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে স্পোরোজোয়েটগুলো গোলাকার ক্রিস্টোজোয়েটে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্রিস্টোজোয়েট ক্রমাগত নিউক্লিয়াস বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইজন্ট দশায় উপনীত হয়। সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হয়ে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় যা ক্রিস্টোমেরোজোয়েট নামে পরিচিত। পরিণত ক্রিস্টোমেরোজোয়েটগুলো সাইজন্টের প্রাচীর বিদীর্ঘ করে যুক্তের সাইন্সয়েডে আশ্রয় নেয়।

এভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবী যুক্তে প্রিএরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্নের পর উৎপন্ন মেরোজোয়েটগুলো নতুন যুক্তকোষকে আক্রমণের মাধ্যমে এক্সোএরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির সূচনা করে যা প্রবর্তীতে সাইজন্ট দশায় পৌছায়। সাইজন্ট দশা থেকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই বিভক্ত নিউক্লিয়াসকে ঘিরে সাইটোপ্লাজম জমা হওয়ার মাধ্যমে নতুন কোষ সৃষ্টি হয় যাদেরকে মেটাক্রিস্টোমেরোজোয়েট বলে। এগুলো আক্রান্ত যুক্ত কোষ বিদীর্ঘ করে বের হয়ে আসে।

ঘ ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু *Plasmodium* এর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে অবশ্যই মানুষের দেহ এবং মশকী প্রয়োজন। কারণ জীবন চক্রের যৌন দশাটি মশকীর দেহে এবং অযৌন দশাটি মানুষের দেহে সম্পন্ন হয়। এখানে মশকীর দেহে প্রথমে দুপ্রকার গ্যামিটোসাইট প্রবেশ করে সেখানে তারা মিলিত হয়ে জাইগোট উৎপন্ন করে। জাইগোটটি শেষে মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে স্পোরোজোয়েট উৎপন্ন করে। উৎপন্ন স্পোরোজোয়েট পুনরায় মশকীর দেহে আক্রমণ করে না বরং মানুষের দেহে চলে আসে। এরপর স্পোরোজোয়েট প্রথমে যুক্ত কোষ ও পরে লোহিত রক্তকণিকা আক্রমণ করে এবং সেখানে অযৌন জনন ঘটায়। তবে মানুষের দেহে পরজীবী শুধুমাত্র অযৌন চক্রের মাধ্যমে বারবার সাইজোগনি সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু যৌন চক্রের জন্য অবশ্যই মশকী প্রয়োজন। সুতরাং আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অ্যানোফিলিস মশকীই পরজীবীটির প্রাথমিক পোষক।

প্রশ্ন **৫৬**



ম্যালেরিয়া কলেজ, সিলেট।

- ক. মাইকোরাইজাল ছত্রাক কী? ১
- খ. সিনোসাইট মাইসেলিয়াম বলতে কী বুঝ? ২
- গ. চিত্রে প্রদর্শিত উক্তিদের পত্রন্ত্র দিয়ে প্রজনন অংশ উন্মুক্ত হয়ে ক্রমশ: বিস্তার লাভ করে যে শস্য-রোগের সৃষ্টি করছে তার লক্ষণসমূহ উল্লেখ কর। ৩
- ঘ. কী কী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্ভব, এ ব্যাপারে তোমার সুপ্রস্তুত মতামত দাও। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উক্তিদের সবু মূল বা মূলরোমের চারদিকে বা অভ্যন্তরে জালের মত বেষ্টনকারী নিদিষ্ট ছত্রাকই মাইকোরাইজাল ছত্রাক।

ব ছত্রাকের ক্ষেত্রে অনেকগুলো হাইফি একত্রে অবস্থান করে ছত্রাক এর দেহ গঠন করলে তাকে মাইসেলিয়াম বলে। ছত্রাকের উভ মাইসেলিয়াম এক বা একাধিক নিউক্লিয়াসযুক্ত হতে পারে। বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রস্থপ্রাচীরবিহীন মাইসেলিয়ামকে সিনোসাইটিক মাইসেলিয়াম বলে। যেমন— *Mucor, Saprolegnia* ইত্যাদিতে ছত্রাকে ইহা বিদ্যমান।

গ উদ্বীপকের চিত্রে প্রদর্শিত উদ্বিদের পত্ররন্ধু দিয়ে প্রজনন অংশ উন্মুক্ত হয়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করে—

ধানের ব্রাইট রোগ সৃষ্টি করে। *Xanthomonas oryzae* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়। নিচে এ রোগের ক্ষণসময় উল্লেখ করা হলো—

- সাধারণত আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসের দিকে এ রোগের সূচনা হয়।
- পাতায় ডেজা অর্ধস্বচ্ছ লম্বা দাগের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাতার শীর্ষে শূরু হয়।
- দাগ ক্রমশ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড় হতে থাকে এবং চেউ খেলানো প্রস্তু বিশিষ্ট হয়।
- দাগগুলো ক্রমশ হলুদ বা হলদে সাদা বর্ণের হয়।
- সকালে দুধের মতো সাদা বা অর্ধস্বচ্ছ রস আক্রান্ত স্থান থেকে ধীরে প্রবাহিত হয়।
- শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্যাপ্রোফাইটিক ছত্রাকের আক্রমণে ক্ষত স্থান ধূসর বর্ণের হয়।
- আক্রমণ বেশ হলে পাতা দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং গাছটি মারা যায়।
- লাগানোর ১-৩ সপ্তাহের মধ্যে চারাও প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রমণ বেশ হলে চারা ঢলে পড়ে।
- ধানের ছড়া বন্ধ্যা হয়, তাই ফলন ৬০% পর্যন্ত কম হতে পারে।
- ধানের শীর্ষে কোনো ফলন হয় না।

ঘ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্ভব, নিচে সে ব্যাপারে আমার সুস্পষ্ট মতামত তুলে ধরলাম—

প্রতিকার ও প্রতিরোধ :

- সবচেয়ে কার্যকরী হলো রোগ প্রতিরোধক প্রকরণ চাষ করা।
- বীজই রোগ জীবাণুর প্রধান বাহন। ব্রিচিং পাউডার (100 mg/ml) এবং জিঙ্ক সালফেট (2%) দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়।
- কপার যৌগ, অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ভালো সুফল আনে না, কিছুটা উপকার হয়।
- জমিকে অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া ধানের খড়, নিজ থেকে গজানো চারা সরাতে হবে।
- বীজতলায় পানি কম রাখতে হবে, অতিবৃষ্টির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। চারা থেকে চারার দূরত্ব, লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব, সার প্রয়োগ (বিশেষ করে ইউরিয়া) বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে।
- বীজ বুনা বা চারা লাগানোর আগে জমিকে ভালোভাবে শুকাতে হবে, পরিযোজ্য খড় ও আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোপণের সময় চারাগাছের পাতা ছাঁটাই করা নিষেধ।
- নাইট্রোজেন সার বেশি ব্যবহার করা যাবে না।
- গাছ আক্রান্ত হলে ক্ষেত্রে প্রতি 2 kg ব্রিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।
- ফিনাইল সালফিউরিক অ্যাসিটেড এম. ক্লোরামফেনিকল $10-20$ লিটার পরিমাণে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেত্রে ছিটালে রোগ নিয়ন্ত্রণ হয়।
- বীজ ব্যবনের আগে 0.1% সিরিসান দ্রবণে 8 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজবাহিত সংক্রমণ রোধ হয়।

ক. ATP এর পূর্ণরূপ লিখ।

খ. ইমাস্কুলেশন বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্বীপকে 'P' এর অভ্যন্তরে সংঘটিত 'Q' এর প্রজনন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

ঘ. 'Q' দ্বারা সৃষ্টি রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা কর।

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ATP এর পূর্ণরূপ Adenosine Triphosphate।

খ কোন উদ্বিদের পুঁকেশরগুলোকে বন্ধ্যাকরণ বা অকার্যকর করাকে ইমাস্কুলেশন বলে। যে পুঁপকে মাত্রপুঁপ হিসেবে ধরা হয় তা যদি উভলিঙ্গ হয় তাহলে ইমাস্কুলেশন করা হয়। পরিপক্ষ হৃবার আগেই পুঁপ থেকে পুঁকেশর ছিড়ে ফেলা বা সরিয়ে ফেলাকে ইমাস্কুলেশন বলা হয়। ইমাস্কুলেশনের ফলে স্বপ্নরাগায়ন ঘটতে পারে না।

গ উদ্বীপকে উল্লিখিত 'P' দ্বারা RBC অর্থাৎ Red Blood Cell তথা লোহিত রক্ত কণিকাকে এবং 'Q' দ্বারা Plasmodium নামক ম্যালেরিয়ার জীবাণুকে নির্দেশ করা হয়েছে। মানবদেহের লোহিত রক্তকণিকায় এ জীবাণু এরিথ্রোসাইটিক সাইজেগানি নামক প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। প্রক্রিয়াটির বর্ণনা নিম্নরূপ—

প্রথমে মাইক্রো-মেটক্রিটোমেরোজয়েটগুলো ঘৃত কোষ থেকে লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে এবং খাদ্য গ্রহণ করে স্ফীত ও গোলাকার হয়। এই দশাকে ট্রিফোজয়েট দশা বলে। এ অবস্থায় জীবাণুর দেহে কুম একটি কোষ গহ্বর ও ছোট নিউক্লিয়াস দেখা যায়। এটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী দশা। কোষ গহ্বরটি ধীরে ধীরে বড় হয় এবং নিউক্লিয়াসটি এক পাশে সরে যায়, ফলে জীবাণুটি একটি আণ্টি আকৃতি লাভ করে। এই অবস্থাকে সিগনয়েট রিং বলা হয়। এ দশায় জীবাণু ক্ষণপদবিশিষ্ট Amoeba এর আকৃতি প্রাপ্ত হয় তখন একে অ্যামিবয়েড ট্রিফোজয়েট বলে। এ সময় লোহিত রক্ত কণিকাটি আকারে স্ফীত হয় এবং সাইটোপ্লাজমে কৃত্রি কৃত্র দানা দেখা যায়। এগুলোকে সাফনার্স দানা বলে। অ্যামিবয়েড ট্রিফোজয়েট দশার কোষস্থ নিউক্লিয়াস বারবার বিভাজনের মাধ্যমে $12-18$ টি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এই অবস্থাকে সাইজট বলা হয়। এর সাইটোপ্লাজমে হিমোজিনে নামক বর্জ্য পদার্থ জমা হয়। সাইজট দশার প্রতিটি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম ও প্লাজমামেম্ব্রেনসহ বিভক্ত হয়ে $12-18$ টি মেরোজয়েট এ পরিণত হয়। মেরোজয়েটগুলো গোলাপের পাপড়ির ন্যায় দুই স্তরে সজ্জিত হয়। একে রোজেট বলে। পরবর্তী অবস্থায় লোহিত রক্ত কণিকাগুলো ভেঙে যায় এবং মেরোজয়েটগুলো প্লাজমায় বের হয়ে আসে। মুক্ত মেরোজয়েট নতুন লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে এবং একইভাবে চক্রটি পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

ঘ উদ্বীপকে 'Q' দ্বারা নির্দেশিত Plasmodium নামক জীবাণু সৃষ্টি রোগটি হলো ম্যালেরিয়া। এ রোগটি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় নিম্নরূপ—

প্রতিরোধের ক্ষেত্রে : স্ত্রী Anopheles মশকী এই রোগের জীবাণু বহন করে থাকে এবং এক রোগী থেকে অন্য সুস্থ দেহে সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। এজন্য বলা যায়, মশকী নিধনই ম্যালেরিয়া জ্বর প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। মশকী নিধনের জন্য মশকীর প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস করা, প্রজনন ক্ষেত্রে নিয়মিত ঔষধ ছিটানো, মশকীর লার্ভা ডক্সগার্কারী গাপ্লী, চেলা, খলিশা মাছ চাষ করা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া ঘরে মশকীর ব্যবহার, মশকী নিধনকারী রাসায়নিক স্পেস করা, মশকীরোধী ক্রিম ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া বাড়ির আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে তুলসি গাছ লাগালে মশকীর উপন্ধৰ কর হয়।

উপরোক্ত সতর্কতাসমূহ মেনে চললে তথা সচেতন থাকলে এ রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

প্রতিকারের ক্ষেত্রে :

- ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরমার্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ক্লোরোকুইন, নিভাকুইন, ম্যাপাক্রিন, প্যালিন্ড্রিন ইত্যাদি ম্যালেরিয়ার জীবাণু ধ্বংসের ভালো ঔষধ।
- রোগীকে সর্বদা মশারীর ভিতরে রাখতে হবে।
- রোগীকে যেন কোনোভাবেই মশা কামড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা মশকীর মাধ্যমে রোগীর দেহ থেকে এই রোগীর পরজীবী অন্য সৃষ্টি ব্যক্তির দেহে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ জামান সাহেব রাজামাটি বেড়াতে গিয়ে কয়েকদিন পরেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দিনিন্তি সময় পরপর কাঁপুনিসহ জুর আসায় ভাস্তারের কাছে গেলেন। ভাস্তার তার রক্ত পরিষ্কার মাধ্যমে দেখলেন রক্তের বিশেষ একটি কণিকার সংখ্যা খুবই কম। ভাস্তার তাকে ঔষধ দেয়ার পাশাপাশি বললেন, এক ধরনের এককোষী পরজীবী আক্রমণে এই রোগ দেখা দেয় এবং কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে ইহা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

(অন্ত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল)

- | | |
|--|---|
| ক. মেরোজাইগোট কি? | ১ |
| খ. ট্রান্সজেনিক উত্তিদ বলতে কি বুঝ? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের বিশেষ কণিকায় পরজীবীটির সংখ্যারূপ্তির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকের শেষের উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

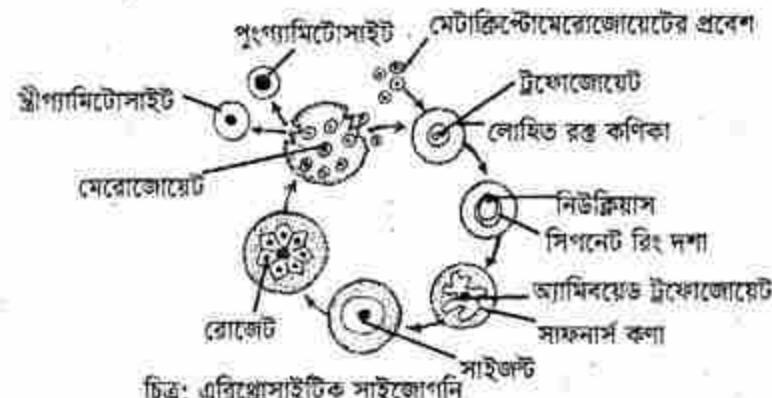
৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌন মিলনের সময় ব্যাকটেরিয়া দাতা কোষ হতে আংশিক ক্রোমোজোম গ্রহণের মাধ্যমে প্রাচীতা কোষ যে জাইগোট তৈরি করে তাই হলো মেরোজাইগোট।

খ জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যে সব উত্তিদ সৃষ্টি করা হয় তাদেরকে ট্রান্সজেনিক উত্তিদ বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় রিকমিনেন্ট DNA কৌশল প্রয়োগ করে স্কট রিকমিনেন্ট DNA কে কোল বাহক বা মাইক্রোইনজেকশনের মাধ্যমে উত্তিদ কোষের প্রোটোপ্লাস্টে প্রবেশ করানো হয় এবং পরবর্তীতে ঐ কোষ থেকে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক উত্তিদ তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী ভূট্টা তৈরি করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে উচ্চিষ্ঠ লক্ষণগুলো দেখে বোৱা যায় জামান ম্যালেরিয়া জুরে ভুগছেন। Anopheles মশকীর মাধ্যমে ম্যালেরিয়া জীবাণু Plasmodium মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। Anopheles মশকীর দংশনের মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণু দ্বারা জামান প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। জামানের যকৃত কোষ থেকে বের হওয়া জীবাণুর মেরোজয়েট দশা লোহিত রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে ভেতরে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা সিগনেট রিং, অ্যামিবোড ট্রফোজয়েট দশা পার করে বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট সাইজন্ট দশায় পৌছায়। সাইজন্ট বহুবিভাজন প্রক্রিয়ায় মেরোজয়েট উৎপন্ন করে। এ সময় কোষে বিষাক্ত হিমোজয়েনসহ প্রাজমায় বেরিয়ে আসে এবং বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। একই সাথে মেরোজয়েটগুলোকে ধ্বংস করার জন্য শ্রেতকণিকা অতিরিক্ত পাইরোজেন নামক বিষাক্ত পদার্থ ক্ষরণ করে। আর এর ফলেই জামানের

কম্পন দিয়ে জুর শুরু হয়। পরবর্তীতে মেরোজয়েটগুলো পুনরায় লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে তার জীবনচক্র সম্পন্ন করতে থাকে। এ চক্রকে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি বলে। অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জীবাণুর এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির মাধ্যমেই জামান উত্ত পরজীবী দ্বারা ম্যালেরিয়া জুরে আক্রান্ত হয়েছিলেন।



ঘ জামানের রোগের লক্ষণ থেকে বুৰো যায় সে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত। Plasmodium-এর আক্রমণে এ রোগ হয়। সতর্কতা অবলম্বনে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ রোগ প্রতিহত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মশার প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস : মশকী বস্থ, পচা পানিতে ডিম পাড়ে এবং সেখানে ডিম ফুটে লার্ভা ও পিউপা দশার বিকাশ ঘটে। তাই মশা নিধনের জন্য মশার জননক্ষেত্রগুলো বিনাশ করাই উত্তম।

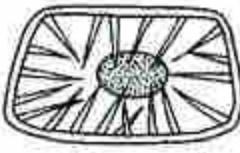
মশার সার্জ ও পিউপা ধ্বংস : যেসব জলাশয়ে মশকী ডিম পাড়ে সেখানে পানির ওপর কেরোসিন বা পেট্রোল জাতীয় তেল ছিটিয়ে দিলে পানির ওপর একটি পাতলা স্তর সৃষ্টি হয়। ফলে এ স্তর ভেদ করে মশকীর লার্ভাগুলোর পক্ষে বাতাস গ্রহণ সম্ভবপর না হওয়ায় তারা মারা পড়ে। বিএইচসি, ডায়েলিন্ড্রিন ইত্যাদি কীটনাশক ওষুধ তেলের সাথে মিশিয়ে পানিতে ছিটিয়ে দিলে মশকীর লার্ভা ও পিউপা মারা যায়। জলাশয়ে কই, খলসে, তেলাপিয়া জাতীয় লার্ভা খাদক মাছ চাষের মাধ্যমে মশকীর লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা যায়।

পৃষ্ণাঙ্গ মশকী নিধন : দংশন উদ্যাত মশকী, হাত বা মসকুইটো র্যাকেট দিয়ে মেরে ফেলা। বিভিন্ন ফাঁদের সাহায্যে মশকী ধরা। বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান যেমন- সালফার ডাইঅক্সাইডের ধোয়া মশা তাড়াতে বা মেরে ফেলতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও বিকিরণ দিয়ে বন্ধ্যোত্তৃ সৃষ্টির মাধ্যমে মশার বংশবিস্তার রোধ করা যায়।

মশকীর দংশনের হাত থেকে আঘরক্ষা : শয়নকক্ষে মশারী ব্যবহার করা। দেহের অনাবৃত অংশে বিশেষ ক্রিম বা লোশন লাগানো। মশকী নিধন কয়েল জুলানো বা স্প্রে ব্যবহার করা। ঘরের দরজা জানালায় ঘন তারের নেট লাগানো। মশার উৎপাত বেশি এবূপ জায়গা থেকে শয়ন কক্ষ দূরে রাখা।

কাজেই উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়: অণুজীব

১০৭. 'ভাইরাস' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
 ① উপকারি ② অপকারি
 ③ বিষ ④ সংক্রামক ৩
১০৮. অ্যাটিবায়োটিক কাদের দেহে কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে অক্ষম? (জ্ঞান)
 ① ভাইরাস ② ব্যাকটেরিয়া
 ③ ছত্রাক ④ শৈবাল ৩
১০৯. ভাইরাস এর মাথার ফিল্টরী প্রোটিন নির্মিত আবরণকে কী বলে? (জ্ঞান) /ৰ. বো-১০/
 ① প্রাইমামেম্ব্রেন ② কলার
 ③ জিনোম ④ ক্যাপসিড ৩
১১০. কোথায় প্রিস্ট্রক RNA দেখা যায়? (অনুধাবন) /ৰ. বো-১০/
 ① ব্যাকটেরিওফাইজ ② কলিফাইজ
 ③ রিওভাইরাস ④ ইনফ্লুয়েঝা ভাইরাস ৩
১১১. রিও ভাইরাসে কোনটি থাকে? (জ্ঞান)
 ① এক সূত্রক DNA ② দ্বি-সূত্রক DNA
 ③ এক সূত্রক RNA ④ দ্বি-সূত্রক RNA ৩
১১২. কোন ভাইরাসটি পার্টিউট আকৃতির? (গোণে)
 ① T₂ ফায় ② ভ্যারিনিয়া
 ③ HIV ④ TMV ৩
- ১১৩.
- 
- চিত্রের গঠনটির নাম কী? (অনুধাবন) /ৰ. বো-১০/
 ① T₂-ফায় ② ভ্যারিনিয়া
 ③ TMV ④ পোলিও ৩
১১৪. সংক্রমণ ক্ষমতাহীন ভাইরাসকে কী বলে? (জ্ঞান)
 ① ডিরিয়ন ② ক্যাপসোমিয়ার
 ③ পেপলোমিয়ার ④ নিউক্লিওক্যাপসিড ৩
১১৫. মানবদেহে বস্তু রোগ সৃষ্টি করে কোন ভাইরাস? (জ্ঞান)
 ① ডেরিওলা ② বুবিওলা
 ③ র্যাবিস ④ H₁V₁ ৩
১১৬. চিউলিপ ফুলের পাপড়িতে বর্ণবিচ্ছিন্ন সৃষ্টি করে কোন অণুজীব? (অনুধাবন)
 ① ব্যাকটেরিয়া ② ভাইরাস
 ③ ছত্রাক ④ শৈবাল ৩
১১৭. কোন বিজ্ঞানী ব্যাকটেরিওফায়ের নামকরণ করেন? (জ্ঞান)
 ① F.C. Bawden ② A. Mayer
 ③ N.W. Pirie ④ d' Herelle ৩
১১৮. পেপের রিং স্পট রোগের জন্য নামী নিচের কোন ভাইরাসটি? (জ্ঞান)
 ① H₁N₁ ② T₂ ফায়
 ③ HIV ④ PRSV ৩
১১৯. কোনটি সোয়াইন ফ্লু রোগের জন্য দায়ী? (অনুধাবন)
 /প্রাচীন এবং উৎস থেকে অবেগাত্মক পদ্ধতি ক্ষেত্রে চৰক/
 ① র্যাবিস ② ডেরিওলা
 ③ বুবিওলা ④ H₁N₁ ৩
১২০. নিচের কোনটি PRSV এর প্রাকৃতিক বাহক? (জ্ঞান)
 ① এফিড ② মাছ
 ③ পিপড়া ④ ডেলাপোকা ৩
১২১. নিচের কোন হেপাটাইটিস সবচেয়ে ঘারান্ক?
 (জ্ঞান)
 ① হেপাটাইটিস এ ② হেপাটাইটিস বি
 ③ হেপাটাইটিস ডি ④ হেপাটাইটিস ই ৩
১২২. 'হাত ভাজা জ্বর' নিচের কোন জ্বরের আরেকটি নাম? (জ্ঞান)
 ① ডেঙ্গু জ্বর ② ম্যালেরিয়া জ্বর
 ③ বাতজ্বর ④ সাধারণ জ্বর ৩
১২৩. ব্যাকটেরিওলজির জনক কে? (জ্ঞান) //ৰ. বো-১০/
 ① এরেনবার্গ ② রবার্ট হুক
 ③ লুই পাস্তুর ④ লিউইন হুক ৩
১২৪. ব্যাকটেরিয়া শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
 ① দণ্ড ② বিষ
 ③ বৃক্ষির ফোটা ④ ক্ষুদ্র প্রাণী ৩
১২৫. ব্যাকটেরিয়া সবনিম্ন কত তাপমাত্রা পর্যন্ত বাঁচতে পারে? (জ্ঞান)
 /ৰ. বো-১০/
 ① - ২০০° সে. ② - ১৭০° সে.
 ③ - ১২০° সে. ④ - ১০০° সে. ৩
১২৬. কোন ব্যাকটেরিয়া পাতের আংশ ছড়াতে সাহায্য করে? (জ্ঞান) /ৰ. বো-১০/
 ① Lactobacillus ② Clostridium
 ③ Nitrosonamonas ④ Azotobacter ৩
১২৭. Plasmodium vivax এর সুষ্কাল কত দিন? (জ্ঞান)
 ① ৮-২৫ ② ১১-১৬
 ③ ১২-২৫ ④ ১৫-৩০ ৩
১২৮. ম্যালেরিয়া জ্বর সৃষ্টির পর্যায়ে পরজীবীর কোন দশাটি দেখা যায়? (অনুধাবন) /ৰ. বো-১০/
 ① মেরোজয়েট ② সেপারোজয়েট
 ③ ক্রিটোমেরোজয়েট ④ ক্রিটোজয়েট ৩
১২৯. ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষের— (গোণে)
 i. রক্তশূন্যতা দেখা দেয়
 ii. শ্বেষ বড় হয়ে যায়
 iii. বারবার পাতলা পায়খানা হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ৩
১৩০. ব্যাকটেরিয়া বাবহৃত হয়— (উচ্চর দক্ষতা) /ৰ. বো-১০/
 i. তেল অপসারণে
 ii. অ্যাসিটেন তৈরিতে
 iii. ডিটামিন তৈরিতে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ৩
১৩১. ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হচ্ছে—
 (উচ্চর দক্ষতা) /ৰ. বো-১০/
 i. চোখের সাদা অংশ হলুদ হওয়া
 ii. চামড়ায় ছেট ছেট লাল ফুসকুড়ি
 iii. সমগ্র শরীরে ব্যথা অনুভব
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ও iii
 ③ i ও iii ④ i, ii ও iii ৩

১৩২. চিত্র 'ক' এর বৈশিষ্ট্য হলো—

(উচ্চতর সূক্ষ্মতা) /পি. লে.-১৫/

- এটি একটি কমাকৃতির ব্যাকটেরিয়া
- এটি কলেরা রোগের জীবাণু
- এটি একটি গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii

- গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩৩. ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষপাত্রীদের বাইরে একটি পিঙ্কল ও আঠালো সূর থাকে। এ সূরটি— (উচ্চতর সূক্ষ্মতা)

- বাইরের আঘাত থেকে কোষকে রক্ষা করে
- ব্যাকটেরিয়াকে শুক্রতা হতে রক্ষা করে
- পলিস্যাকারাইড বা পলিপেপটাইডের পলিমার দ্বারা গঠিত

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii

- গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩৪. প্রতিকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া অন্তর্ভেঙ্গ মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে। এ অন্তর্ভেঙ্গ— (ওয়েব)

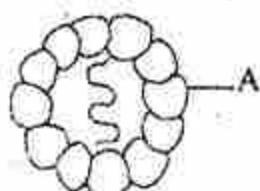
- গোলাকার বা ডিম্বাকার ধরনের
- পুরু প্রাচীর দিয়ে আবৃত
- অঙ্কুরিত হয়ে দুটি অপত্য ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii

- গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩৫.



চিত্র A চিহ্নিত অংশটি— (উচ্চতর সূক্ষ্মতা) /পি. লে.-১৫/

- অ্যান্টিজেন-এর গুণাবলি বহন করে
- প্রোটিন দ্বারা গঠিত
- আবরণগঠিত একককে ক্যাপসোমিয়ার বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii

- গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩৬. ভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—

(উচ্চতর সূক্ষ্মতা) /পি. লে.-১৫/

- সকলেই অকোষীয়
- বিপাকীয় এনজাইম নেই
- জিমেটিক রিক্ষিলেশন ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii

- গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

অনুজ্ঞেস্টি পত্রে ১৩৭ ও ১৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জুয়েলের হঠাতে করে মাথা ব্যথা, মাস্স পেশিতে ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, ক্রুধামন্দা এবং বমি বমি ভাব দেখা দেয়। তারপর দুস্থিতাহীন মধ্যে তার জিডিস দেখা দেয়। ভাস্তুরের কাছে গেলে ভাস্তুর তাকে LFT পরীক্ষা করতে দেন এবং পরীক্ষায় রক্তরসে ট্রান্সঅ্যামাইলেজের পরিমাণ ২০০-২০০০ U/L এর মধ্যে পাওয়া যায়।

১৩৭. জুয়েল কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে? (অনুধাবন)

- ক) ইনফ্রায়োজা খ) হেপাটাইটিস

গ) এইডস

ঘ) ডেজু

ঞ

১৩৮. জুয়েল যদি সময় মতো সুটিকিল্স গ্রহণ না করে

তবে পরবর্তীতে তার— (উচ্চতর সূক্ষ্মতা)

- i. লিভার ক্যাসার হতে পারে

- ii. ব্রাইড ক্যাসার হতে পারে

- iii. লিভার সেরোসিস হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii

- খ) i ও iii

- গ) ii ও iii

- ঘ) i, ii ও iii

ঞ

উচ্চীপক্ষটি পত্রে ১৩৯ ও ১৪০ নং প্রশ্নের দাও।

ড. আজমল চৌধুরী একটি মাইক্রো E. coli ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে দুটি ব্যাকটেরিয়া একধরনের নালি দ্বারা পরম্পরের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। তিনি বুঝতে পারেন যে, ব্যাকটেরিয়া দুটি একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন করছে।

১৩৯. বিশেষ প্রক্রিয়াটির নাম কী? (অনুধাবন)

- ক) ছিবিভাজন খ) অনুলিপ্তি

- গ) মুকুলোদগ্ধম

- ঘ) বংশগতীয় পুনঃসংযোগ

ঞ

১৪০. উত্তর বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া— (উচ্চতর সূক্ষ্মতা)

- i. নতুন সৃষ্টি অপত্য কোষে মিশ্র চরিত্রের বিকাশ ঘটে

- ii. দাতা কোষে মেরোজাইগোটি গঠিত হয়

- iii. গ্রহীতা কোষ ছিবিভাজনের মাধ্যমে নতুন অপত্য কোষ সৃষ্টি করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii

- গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

ঞ

অনুজ্ঞেস্টি পত্রে ১৪১ – ১৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

দিশা তার বাবার সাথে তাদের গ্রাম ঘুরে দেখছিল। সে দেখল যে, একটি পুরুরে পাট ডুবিয়ে রাখা হয়েছে।

সে তার বাবাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তার বাবা তাকে জানায় যে এভাবে রাখলে পাটে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যা পাট থেকে আংশ ছাঢ়াতে সাহায্য করে।

১৪১. দিশার বাবা কোন ব্যাকটেরিয়ার কথা বলেছেন?

(অনুধাবন)

- ক) Clostridium খ) Lactobacillus

- গ) Pseudomonas ঘ) Azotobacter

ঞ

১৪২. উত্তর গণের ব্যাকটেরিয়ার একটি প্রজাতি মানব

দেহে নিচের কোন রোগটির সম্মত ঘটায়?

(ওয়েব)

- ক) ধনুষ্টকার খ) কলেরা

- গ) টাইফিয়েড ঘ) যক্ষ্যা

ঞ

১৪৩. ব্যাকটেরিয়াটি পাটের আংশ ছাঢ়ানো ছাড়াও —

(ওয়েব)

- i. শর্করা হতে অ্যালকোহল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়

- ii. বাতাসে নাইট্রোজেন গ্যাসকে সরাসরি লবণে পরিণত করে

- iii. টাটকা খাবারকে পচিয়ে খাওয়ার অনুপোয়োগী করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii

- গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

ঞ